২৪৩

সাক্ষরতা বুলেটিন

ভাদ্র ১৪২১

আগস্ট ২০১৪

সাক্ষরতা বুলেটিন

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের
বেসরকারি ঐক্য প্রতিষ্ঠান
গণসাক্ষরতা অভিযান
থেকে প্রকাশিত

সংখ্যা ২৪৩ ভাদ্র ১৪২১ আগস্ট ২০১৪

সূ চি প ত্র

৩ **আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে**
জাতিসংঘ মহাসচিবের বাণী

৪ **শফি আহমেদ**
এসো ধরি হাতে হাত

৯ **সঞ্জীব দ্রং**
আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সেতুবন্ধন

১১ **মথুরা ত্রিপুরা**
শিক্ষা আইন ও আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার

১৫ **সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া**
শিক্ষার মান

১৮ **কুমার প্রীতীশ বল**
সবার আগে চাই জুম্ম জনগোষ্ঠীর আনন্দ বেদনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

২১ **মো. ইয়াসিন আরাফাত**
আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলার ব্যবহার
শিখন জটিলতা ও উত্তরণ

২৭ **তথ্যকণিকা**

২৯ **সংবাদ**

সাক্ষরতা বুলেটিন-এ
প্রকাশিত রচনাসমূহের
ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ,
মতামত সম্পূর্ণত
লেখকের,
গণসাক্ষরতা অভিযান
কর্তৃপক্ষের নয়।

সৌজন্য:
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উপলক্ষে

বাণী

বান কি মুন

জাতিসংঘ মহাসচিব

৯ আগস্ট ২০১৪

এ বছরের বিশ্বের আদিবাসী জনগণের আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপিত হতে যাচ্ছে এক বিশেষ গুরুত্ববহ সময়ের বিন্দুতে, যখন পৃথিবী সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সুপ্রতিজ্ঞ এবং নতুন একটি আইনানুগ জলবায়ু সমঝোতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করতে যাচ্ছে, যার গন্তব্য হল টেকসই উন্নয়নের জন্য নতুন রূপকল্প নির্মাণ এবং এসবই সম্পাদিত হবে ২০১৫ সালের মধ্যে।

এইসব লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে আদিবাসী জনগণের কেন্দ্রীয় প্রত্যাশা জড়িত এবং তারাই প্রগতির শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। তারা যাতে আমাদের সকলের ভবিষ্যত নির্মাণে অবদান রাখতে পারে, সেজন্য তাদের অধিকারের নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে।

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ে জাতিসংঘ ঘোষণায় তাদের বেঁচে থাকা, মর্যাদা, কল্যাণ এবং অধিকারের সবনিম্ন মানের কথা উল্লিখিত আছে। কিন্তু ওইসব আদর্শ এবং বিশ্বের অধিকাংশ আদিবাসীদের জীবনধারণের বাস্তবতার মধ্যে এখনো বিপুল দূরত্ব অস্তিত্বমান।

যদিও বেশ কয়েকটি দেশের সাংবিধানিক ও আইনগত পরিকাঠামোর মধ্যে আদিবাসীদের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু অনেক দেশে এখনো তা দেয়া হয়নি; ফলে আদিবাসীদের জীবন ও ভূমির প্রতি হুমকিও অদ্যাবধি রয়ে গেছে। ঐতিহাসিকভাবে প্রচলিত অবিচার অনেকসময়ই তাদেরকে দূরত্ব ও দারিদ্র্যের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। সমাজের শক্তিকাঠামো অতীতেও আদিবাসীদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এখনো বাধা সৃষ্টি করছে। অগ্রগতির ধারায় তারা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি বাধার সম্মুখীন। এইসব নেতিবাচক উপাদানের অভিঘাত আদিবাসী সম্প্রদায়ের বাইরে সমগ্র বিশ্বসমাজের ওপর আছড়ে পড়ে।

নতুন উন্নয়ন অভিলক্ষ্যকে সফল করার জন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর চাহিদাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমরা যখন আগামী সেপ্টেম্বরে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী বিষয়ে বিশ্বসম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের আহ্বান হল, আদিবাসী ও তাদের প্রতিনিধিবৃন্দের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে কাজ করতে হবে, তাদের জীবনমান উন্নয়ন করতে হবে, তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

আসুন, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অমূল্য ও সুনির্দিষ্ট স্বাতন্ত্র্যকে সম্মিলিতভাবে স্বীকার ও উদযাপন করি। আরো দৃঢ়ভাবে তাদের ক্ষমতায়িত করি এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন জানাই।

বিশ্বের আদিবাসী জনগণের আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে, আমি সকল সহযোগী সদ্যসের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন, সকলে মিলে আদিবাসীদের অধিকার সমুন্নত রাখি ও সেসবের নিরাপত্তা বিধান করি, আমাদের সকলের সমাগত ভবিষ্যত গঠনে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(অনুবাদঃ শর্বরী আলোময়ী)

শ ফি আ হ মে দ

এসো ধরি হাতে হাত

সম্প্রতি চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মৌখিক পরীক্ষা নেবার জন্য। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ছাত্র-ছাত্রীরা যা বলেছে তা নিয়ে একটা কৌতুককর বা বেদনাবহ বা বিশ্লেষণী লেখা তৈরি করা যায়। এখানে তা করতে চাইছি না। যাই হোক, দ্বিতীয় দিনে একজন পরীক্ষার্থী পাওয়া গেল, যে খাগড়াছড়ির অধিবাসী, মাতৃভাষা মারমা। চারজনের পরীক্ষক বোর্ডে একজন ছিলেন, যিনি জাতিসত্তায় বাঙালি, কিন্তু বেশ ভালো চাকমা ভাষা জানেন। বোর্ডের সভাপতি ওই পরীক্ষককে অনুরোধ করলেন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে চাকমা ভাষায় কথা বলতে। আমি খুব উৎসুক হয়ে উঠলাম। মেয়েটি মারমাভাষী হলেও সে-ও জানাল যে, চাকমা ভাষায় কথা বলতে তার কোন অসুবিধা হবে না। আমার চার দশকেরও অধিক শিক্ষকজীবনে এ ছিল এক দারুণ অভিজ্ঞতা। আমাদের সহকর্মী যে চাকমা ভাষায় এতটা পারঙ্গম তা দেখে আমি রীতিমত মুগ্ধ ও বিস্মিত। বোর্ডে আর একজন অধ্যাপক ছিলেন, যাঁর সঙ্গে রাঙামাটির দীর্ঘতর যোগাযোগ ছিল, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি ওই ছাত্রীর সঙ্গে চাকমা ভাষায় প্রশ্নালাপ করবেন কি না। তিনি ওই ভাষা সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতার কথা জানালেন।

প্রকৃত অর্থেই ওই মৌখিক পরীক্ষার বৈকালিক অধিবেশন ছিল আমার জন্য এক অপূর্ব এবং ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। চাকমা ভাষা জানা ওই সহকর্মীকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানালাম। একেবারে তৎক্ষণাৎ বললাম, আমার নিজেকে এখন কিছুটা ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। আমার পড়শীর ভাষা আমি জানি না, জানার চেষ্টাও করিনি কোনদিন। অথচ শত শত বছর ধরে পাশাপাশি থাকি আমরা!

স্বাভাবিকভাবেই অনেকগুলি সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। আমাদের তো বেশ কয়েকজন আদিবাসী বন্ধু আছেন। সঞ্জীব, মথুরা ও মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্কটা তো বহু বছরের হল। আমাদের পারস্পরিক কথোপকথনের ভাষাটা আবশ্যিকভাবেই বাংলা। কোনরকম প্রশ্ন না করে এমন একটা রীতিকে উভয় পক্ষ থেকেই মান্য করে চলেছি। সমাজবিজ্ঞানের এই তত্ত্বের বিস্তার ও গভীরতার একটা ঐতিহাসিক ও বৈশ্বিক ভিত্তি আছে। সেকথা স্বীকার করার পরও, আমি যে চাকমা ভাষা অথবা আমার দেশের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্যান্য বহু ক্ষুদ্রজাতিসত্তাদের কোন ভাষা জানি না, অথচ ইউরোপীয়দের একাধিক ভাষা জানি, এমন একটা কঠিন অথচ অনিবার্য সত্য আমাকে আহত করেছিল, বিমূঢ় করেছিল।

আমার অন্য কয়েকটি সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক রচনায় এই পর্যবেক্ষণটা বার বার তুলে ধরেছি। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বা উত্তর আমেরিকার সাহিত্যের ধ্রুপদী এবং সমসাময়িক সাহিত্য কর্ম অথবা বুদ্ধিচর্চার অন্য কোন ক্ষেত্রের যুগান্তকারী কোন গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের জানার সুযোগ দৃশ্যমানভাবেই ব্যাপক ও বেগবান। ওই সাহিত্যের সঙ্গে আমার এমন পরিচয়কে সহজসাধ্য করে তোলার জন্য সুদীর্ঘ কাল ধরে বিশাল প্রকাশনা শিল্প বা বাজার গড়ে উঠেছে। কিন্তু প্রতিবেশী সাহিত্যের খোঁজখবর নেবার জন্য তার সঙ্গে তুলনীয় কোন উদ্যোগের সন্ধান পাওয়া যায় না। ভারতের যে আসাম রাজ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাঙালি বাস করেন, সেখানকার অহমিয়া ভাষায় সমকালীন সাহিত্য, এমনকি অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে যে বাংলা সাহিত্যের সৃজন চলছে শ্রীহট্ট বা সিলেটের ওপারের ওই ভারতীয় রাজ্যে, তা আমরা জানি না;

জানার তেমন কোন আগ্রহ আছে, সেকথাও হলফ করে বলতে পারব না। অথবা মিয়ানমারে কী লেখা হচ্ছে, শ্রীলঙ্কার সাহিত্যে সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন কেমন, বিপুল উর্দু ভাষাভাষী ভারতের এই ভাষার লেখকরা সমকালে কি লিখেছেন তা আমরা জানি না।

কিন্তু অরুন্ধতী রায়ের *God of Small Things*-র একাধিক জলদস্যু সংস্করণ ছাপা হয় ঢাকায়; অমিতাভ ঘোষের বই বেরোনোর পরদিনই তা ঢাকায় পাওয়া যায়, কুশওয়ান্ত সিং তো আমাদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। আর এ সবই সম্ভব হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের ওই মৌলিক ক্ষমতাতত্ত্বের সুবাদে। উপনিবেশবাদীদের ভাষাটাকে সবাই রপ্ত করে নেয়। কেউ কেউ হয়ত কালিবানের মত ক্ষোভ ঝেড়ে বলে যে, আমি তোমার ভাষা শিখে তোমায় গালাগাল করতে শিখেছি। পরিস্থিতিটা একবারে ফটোকপির মত না হলেও, বিশ্বাস করি আমাদের ক্ষুব্ধ আদিবাসী মানুষরা কখনো কখনো বাংলা ভাষার গালাগালের শব্দ দিয়েই বাঙালিদের প্রতি তাদের ঘৃণার প্রকাশ ঘটায়।

ওপরের দু'টি অনুচ্ছেদ বিষয়ে প্রাসঙ্গিকতার বিচ্যুতির অভিযোগ আনলে তা আমি মানব না। এই গভীর ঐতিহাসিক সত্যটাকে আমাদের স্বীকার করতে হবে এবং তার বিরুদ্ধে প্রবল সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। হয়ত বা বাস্তবতার যুক্তি উপস্থাপন করে অনেক তাত্ত্বিক যা অনিবার্য তা খণ্ডানোর প্রচেষ্টাকে শ্রমের অপব্যয় বলে বিবেচনা করতে পারেন। ঠিক আছে, বিদেশ-বিভূঁই না হয় বাদ দিলাম, বাদ দিতে পারি ভারতের কথাও, বিশাল দেশ, কত ভাষা, কত উপ-ভাষা সেখানে। কিন্তু এই আমাদের ছোট আয়তনের বাংলাদেশে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা শেখার একটা সুপরিকল্পিত আয়োজন কি করা যায় না, হোক না সে দীর্ঘ মেয়াদী। মৌখিক পরীক্ষা নেবার সেদিনকার ওই অপরাহ্নে আমার সহকর্মী আর ওই মারমাভাষী ছাত্রীর মধ্যে চাকমা ভাষায় কথোপকথন আমার কাছে যেন এক অলৌকিক বা পরাবাস্তব লগ্ন বলে মনে হচ্ছে, এই এখনো।

বিগত কয়েক বছর ধরে আদিবাসীদের ওপর নিপীড়নের সাক্ষী আমরা, আবার একথাও মানতে হবে যে, আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায়, তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের অনুকূল আবহ সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে একটা কণ্ঠস্বর দিনের পর দিন আরও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জাতীয় পর্যায়ে, বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় আদিবাসীদের ওপর সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বিরতিহীন নিপীড়ন চালানো এবং তার প্রতিক্রিয়ায় আদিবাসীদের সশস্ত্র আত্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের সমাপ্তি টানতে ১৯৯৭ সালে সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। উদ্বাস্তু আদিবাসীরা প্রতিবেশী দেশ থেকে নিজ বাসভূমে ফিরে এসেছিল। যতটা আশায় বুক বেঁধে তারা, মানে ওইসব সহজ সরল, প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসী অকপট আদিবাসীরা, তাদের নিজ বাসভূমে ফিরে এসেছিল, তাদের সেই আশা তেমনভাবে পূরণ হয়নি। কত রকমের মধ্যবর্তী হিংসাত্মক ধ্বংসাত্মক বিনাশী উপাদানের অস্তিত্ব ছিল এই চুক্তির ভাষ্য আর তার প্রকৃত বাস্তবায়নের মধ্যে- সেকথা ভাবলে অবাক হতে হয়। আর তাই আমাদের বন্ধু সঞ্জীব দ্রং-এর ঘরহীন মানুষের কথা বলতে গিয়ে নটে গাছটা আর মুড়োয় না, আদিবাসীদের কান্নার জল আর ফুরোয় না।

যাই হোক, ১৯৯৭ সালের শান্তি চুক্তি যেমন আদিবাসী জীবন, তাদের দুরবস্থা এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের বিষয়টাকে জাতীয় পর্যায়ে সামনে নিয়ে এসেছিল, তেমনি এই জাতিসত্তাসমূহ নিজেদের বিষয়ে আলাদাভাবে ভাবনাচিন্তা করার বা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় অপেক্ষাকৃত জোরদার দাবি জানানোর একটা মঞ্চ তৈরির বাড়তি উৎসাহ ও প্রণোদনা পেয়েছিল তার চার বছর আগে ১৯৯৩ সালে, যখন জাতিসংঘ আদিবাসীদের স্বীকৃতি দানের একটা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট তৈরি করল ৯ আগস্টকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে। জাতিসংঘের এই বিশেষ দিবস ঘোষণা অবশ্য এই সংস্থার সাধারণ কর্মপরিধির মধ্যেই পড়ে।

বিশ্বব্যাপী নানা বিষয়ে জনমত সৃষ্টি এবং জনঅংশগ্রহণকে উৎসাহিত করতে এ ধরনের বিভিন্ন দিবস উদযাপনের একটা রীতি বহুদিন ধরেই গড়ে উঠেছে। খুব জোর গলায় বলা যাবে না, এমন দিবস দুনিয়া জুড়ে পালন করার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কোন লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। তাই যদি হত, তা হলে আজও বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা প্রান্তে মানবাধিকারের লঙ্ঘন একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হত না। ষাটের দশকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াসে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপনের ডাক দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সত্য এই যে, বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষত অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহে নিরক্ষরতাকে এখনো একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পৃথিবীর অনেকগুলি রাষ্ট্রে আদিবাসী অধিকারের বিষয়টির প্রতি খুবই কার্যকরভাবে মনোযোগ দেয়া হয়েছে। আলাদাভাবে নরওয়ে ও অষ্ট্রেলিয়ার নাম উল্লেখ করতেই হয়। তবে নিপাট সত্য এটাই যে, এইসব দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং সামাজিক অস্থিরতাজনিত সমস্যার অনুপস্থিতি এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে মোড়লের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার ক্ষেত্রে অনাগ্রহ তাদের জাতীয় উন্নয়নকে গতিশীল করেছে। এবং তারই ইতিবাচক অভিঘাতে ওইসব দেশে আদিবাসী সমস্যার সুরাহাও সহজতর হয়েছে।

বলে নেয়া ভাল, জাতিসংঘের আদিবাসী দিবস ঘোষণার ভবিষ্যৎ অভিঘাতকে খাটো করে দেখানোর কোন ইচ্ছা নেই আমার। যা বলতে চাইছি, তা হল, জাতিসংঘের অবস্থানের সঙ্গে গৌরব ও

আন্তর্জাতিকতার যোগ যতটা তাৎপর্যবহ, তার কার্যকারিতার বিষয়টা ততটা দৃশ্যমান নয়। কিন্তু ৯ আগস্টকে আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস ঘোষণার একটা বড় প্রতিক্রিয়া অবশ্য দেখা গেছে বাংলাদেশের মত কিছু দেশে। বিশ্ব সম্প্রদায় বহু শতাব্দী ধরে আদিবাসীদের অবস্থার ও স্বীকৃতি বিষয়ে উদাসীন ছিল এবং তাদেরকে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা হিসেবে গণ্য করার বিষয়টিকে অগ্রাধিকারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে তারা তেমন উৎসাহী ছিল না। এমনকি এই তিন দশক আগেও যখন সারা পৃথিবী শীতল যুদ্ধ, স্নায়ু যুদ্ধ, তারকা যুদ্ধ, মহাকাশ অভিযান প্রতিযোগিতার যুদ্ধ এবং দুনিয়ার নানান জায়গার অপেক্ষাকৃত কম সশস্ত্র রাষ্ট্রদের এককাট্টা করে বিভিন্ন জোট সংগঠনে শ্রম ও কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করছিল, তখনও আদিবাসী প্রসঙ্গটা বিশ্বপ্রভুদের নজরের আড়ালেই ছিল। ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত যে আদিবাসী দিবস ঘোষণার জন্য জাতিসংঘকে অপেক্ষা করতে হল, তার পেছনেও ছিল দুই পরাশক্তির নানা কূটনৈতিক এবং সমরতান্ত্রিক সূচিপত্রে অগ্রাধিকারের তালিকা। এই আলোচনায় কোন বৈশ্বিক প্রকল্প উত্থাপনের ইচ্ছা নেই আমার, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালনের সূত্রে প্রসঙ্গ-ক্রমে তা অবশ্য কিছুটা অনুপ্রবেশ করল।

বাংলাদেশে যে আদিবাসী ফোরাম গড়ে উঠল এবং এই সংগঠনের ছায়ায় পরবর্তী কালে নানা রকমের কর্মসূচি গ্রহণ করা হল, সেটা অবশ্যই ওই জাতিসংঘ ঘোষিত একটি আলাদা দিবস উদযাপনের সূত্রেই ঘটেছে। আদিবাসীদের ওপরে নানা নির্যাতনের ঘটনা বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি জনগোষ্ঠীর অনেকের মধ্যেই ক্ষোভ আছে, তারা এই পরিস্থিতির পরিবর্তন চান। কিন্তু সংগঠিতভাবে তাদের মতামত বা অবস্থান জানানোর কোন দৃশ্যমান উদ্যোগ ছিল না। আদিবাসী দিবস পালনের মধ্য দিয়ে এই প্রতিবাদের একটা সংহত রূপ প্রকাশের সুনির্দিষ্ট ও অনুকূল মঞ্চ তৈরি হয়ে উঠল।

অতীতকথার রোমন্থন প্রক্রিয়ায় বিশেষভাবে প্ররোচিত হতে চাই না। তবে প্রায় আবশ্যিকভাবেই মনে পড়ছে ১৯৯৩ সালের বেশ কয়েক বছর বা এক দশকের আগে থেকে বিশেষত পার্বত্য চট্টগ্রাম যেন বাংলাদেশের একটা নিষিদ্ধ অঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ওই এলাকার অধিবাসীদের, প্রকৃতপক্ষে আদিবাসীদের মৌলিক মানবাধিকার হরণ করা হয়েছিল। বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসমূহের মানুষদের চলাচলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করা হয়েছিল। ওইসব মানুষদের আদি সমাজব্যবস্থার মধ্যে স্থানীয় প্রশাসনিক কাঠামোর যে রীতি বলবৎ ছিল, তা বলপূর্বক স্থগিত করা হয়েছিল। বিশেষত নারীদের ওপর নিপীড়নের নানা কাহিনী ব্যাপকভাবে প্রচারিত ছিল। নারী নির্যাতনের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক অত্যাচারের উদাহরণ যেমন খুঁজে পাওয়া যাবে, তেমনি ওই নিপীড়নের মাধ্যমে আদিবাসী সম্প্রদায়সমূহকে অপমান ও অবদমন করার পরিকল্পনাও নিহিত ছিল।

সারা বিশ্ব থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার সরকারি প্রচেষ্টার যথেষ্ট কড়াকড়ি থাকলেও আদিবাসীদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী কিন্তু বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পৌঁছে গিয়েছিল পৃথিবীর নানা প্রান্তে, বিশেষত ইউরোপের দেশগুলোতে। তখন থেকেই এই অঞ্চলের আদিবাসীদের সাহায্য-সহায়তা প্রদান করার কতিপয় উদ্যোগ দেখা যায় ওইসব দেশে। বিশ্ব জনমতকে আদিবাসীদের ওপর নির্যাতনের বিপক্ষে সংগঠিত করে তোলার জন্য বেশ কিছু ব্যক্তি বা সংস্থা তাদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিল। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পর সশস্ত্র এবং অশান্ত পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে থাকে। ভূমি নিয়ে বিরোধ, ব্রিটিশ শাসনামলে এই অঞ্চলের পৃথক শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংস্কার, সামরিক বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী জনগণের সন্ত্রস্ত ও নিরাপত্তাহীন জীবনযাত্রা এবং সর্বোপরি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বা বাঙালিদের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশীসুলভ এবং বন্ধুসুলভ সম্পর্ক রচনায় আস্থার প্রবল সংকট প্রভৃতি বিষয় সামনে উঠে আসতে থাকে।

সবাই একথা জানে যে, আদিবাসীদের ভূমি লুণ্ঠনই অদ্যাবধি বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তা অধ্যুষিত সকল অঞ্চলের প্রধান সমস্যা। কিন্তু সরকারি উদ্যোগে যেমন সুপরিকল্পিত রয়েছে, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অগ্রবর্তী যে অংশ আদিবাসীদের সমস্যা বিষয়ে উদ্বেগ জানানোর জন্য শহীদ মিনারে সমবেত হন, অথবা মানববন্ধনে আদিবাসীদের হাত ধরেন কিংবা আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য যারা নানা সুপারিশ প্রণয়ন করেন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেন, সরকারের সঙ্গে দেন-দরবার করেন, তারাও কিন্তু চুক্তির ধারা অনুযায়ী ভূমি জরিপ হচ্ছে না অথবা অবৈধ দখলদারদের থেকে মুক্ত করে আদিবাসীদের কাছে তাদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে, এমন মৌলিক দাবিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কোন সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সংগঠিতভাবে সামিল হচ্ছেন না।

এমন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেও একথা বলা যায় যে, আদিবাসী সমস্যা বিষয়ে সাধারণভাবে সমাজে একটা অনুচ্চ ও যৌক্তিক সহানুভূতি প্রকাশের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। এবং তা ধীর হলেও প্রচল, আর তাই আদিবাসীদের প্রশ্নটা হিমাগারে তুলে রাখার মত পরিস্থিতি আর এখন বাংলাদেশে নেই। আমাদের দেশের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যার সমাধানে আমরা যেকথাটি বলে থাকি যে, এজন্য দরকার বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সেই অভাবটা এক্ষেত্রেও বিশেষভাবে প্রকট। দেশটা বিগত প্রায় চার দশকে অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে মোটা রেখায় দুটি প্রতিদ্বন্দী শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং নৈতিক দিক থেকে ও বাস্তব কারণে তাদের মধ্যে সহসা মিত্রতার কোন সম্ভাবনাই নেই। তবে বোধ করি, প্রকাশ্যে উচ্চারিত না হলেও এই আদিবাসী প্রশ্নে দুই বিরোধী পক্ষের

নৈতিক অবস্থানে খুব বড় ধরনের কোন হেরফের নেই। উদার ভাবাপন্ন বাঙালি ও আদিবাসী সবাই এই কথাট জানেন। কিন্তু তারপরও আদিবাসীদের অধিকার আন্দোলনের জন্য সব ধরনের যৌক্তিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দুই বড় প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের মধ্যে একটিকে বেছে নেয়া যায়, যারা আদিবাসীদের বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক সমব্যথী। নিকট অতীতেও তারা আদিবাসীদের নানা আয়োজনে সামিল হয়েছেন, তাদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসে ব্যানার হাতে নিয়ে মিছিল করেছেন। কিন্তু অনেকদিনের এই সখ্য কিভাবে যেন পানসে হয়ে গেল, তাও আবার অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের এক দশকেরও পরে। বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই এমন এক অনৈতিহাসিক, বিপর্যয়কর, নিষ্ঠুর ও অপ্রত্যাশিত বিবৃতি প্রদান করল সরকার। আমি বিশ্বাস করি, সরকারের এই অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্তের প্রতি শাসকদলের সবার সহমত নেই। কিন্তু যেহেতু সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং তা প্রায় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরা হল, তাই ওই রাজনৈতিক দলের যেসব নেতা-কর্মী আদিবাসীদের অধিকার আদায়ে এবং তাদের ওপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, তারাও কৌশলগত কারণে আর আগের মত মুখর থাকতে পারলেন না।

বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই,– এমন ঘোষণার আকস্মিকতা ও অযৌক্তিতায় আমরা আহত ও স্তম্ভিত হয়েছিলাম। কিন্তু এর জন্য তেমন কোন দৃশ্যমান প্রতিবাদ-সমাবেশ করতে পারিনি। কোনো অত্যুৎসাহী ও চপলমতি ব্লগারের নির্বুদ্ধিতাসুলভ কোন অভিমত প্রকাশের প্রতিক্রিয়ায় আমরা যেমন দেশ কাঁপানো সমাবেশের সাক্ষী, তেমন প্রবল কোন প্রতিবাদের কথা বলছি না, অথবা কোন বড় রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আয়োজনের কথাও বলছি না, কিন্তু তেল-গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য পুলিশী বাধায় পণ্ড হয়ে যাওয়া অভিযাত্রার মত কোন বড়, জাতীয় এবং প্রকাশ্য উদ্যোগও তো আমরা নিইনি যখন বাংলাদেশের বিশাল বৈচিত্র্যময় মানবসম্পদ-আদিবাসীদের গোষ্ঠীনির্বিশেষে সাধারণ পরিচয়টা কেড়ে নেয়া হল সরকারি ঘোষণার মধ্য দিয়ে। দেশটা যেন সত্যিই দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। তাদের আশেপাশে যারা আছে, তারা প্রায় পরগাছা, অথবা চরম রক্তাল্পতায় ক্লান্ত, অথবা মেরুদণ্ডহীন শামুক প্রজাতির। তাই আদিবাসীদের প্রতি সরকারি বিরাগের কোন প্রতিবাদী প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না।

জানি, এটা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে, বহুসংখ্যক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে, সেসব আলোচনা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তিমূলক যুক্তিদ্বন্দের অবতারণা করা হয়েছে, নিষ্ফলা সেইসব উদ্যোগের পরও আমার মাথার মধ্যে এই জটিল প্রশ্নটা থেকেই থেকেই একটা যন্ত্রণাকাতর অনুভব সৃষ্টি করে। আদিবাসী পরিচয়বাহী মাত্র কয়েক লাখ মানুষ। তাও তারা আবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাংলাদেশের উত্তর থেকে দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন ঘেষাঁ এলাকায়, পার্বত্য চট্টগ্রামে, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন প্রায় বিচ্ছিন্ন জনবসতিতে। পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়া আর অন্য কোথাও তাদের ওপর নিপীড়নের বিরুদ্ধে কোন ধরনের প্রতিরোধী আন্দোলনের সংবাদ পাওয়া যায়নি। যদিও অন্যান্য অঞ্চলেও আদিবাসী মানুষ তাদের জমি হারিয়েছে, বেশ কিছু আদিবাসী নারী সম্ভ্রম হারিয়েছে, অনেক আদিবাসী দেশান্তরী হয়েছে। কিন্তু তাদের ক্ষোভকে কোন ভীতি উদ্রেককারী আন্দোলনে সংগঠিত করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, এমন কোন তথ্যের অস্তিত্ব নেই।

তবুও কেন আদিবাসী পরিচয়টাকে এমন সরকারি ঘোষণার মধ্যে ছিনিয়ে নেয়া হল? এই আকস্মিক উদ্যোগের নেপথ্যে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী কলকাঠি নেড়েছিল কি না, তা জানার জন্য আমাদের হয়ত বহুদিন অপেক্ষা করতে হবে। মনের মধ্যে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে যে, এই সরকারের কোন উচ্চ মার্গের মন্ত্রী বা উপদেষ্টা একদিন স্মৃতিকথা লিখবেন এবং তাঁর প্রদত্ত কোন তথ্যের মধ্য দিয়ে আমরা একটা সূত্র পেয়ে যাব। কিন্তু সংশ্লিষ্ট আর একটা প্রশ্ন বিশ্লেষণ করতে গিয়েও হিমসিম অবস্থা আমাদের। সরকার একটা অপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং দেশের সকল সরকারি দপ্তরে জানিয়ে দিল যে, (যদিও আমরা জাতিসংঘের সদস্য, যদিও আমরা জাতিসংঘের নানা আয়োজনে অংশগ্রহণ করে থাকি, যদিও জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীতে আরো বেশি সংখ্যক সৈন্য পাঠানোর জন্য আমরা মুখিয়ে থাকি, যদিও জাতিসংঘ ঘোষিত অন্যান্য দিবস যেমন, পরিবেশ, নারী ও সাক্ষরতা দিবস আমরা যথোচিত মর্যাদার সঙ্গে পালিত হবে) কিন্তু কোন সরকারি সংস্থা বা ব্যক্তি জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিবেক না। সত্য সেলুকস, কি বিচিত্র এই দেশ! জাতিসংঘের ঘোষণাকে নাকচ বা বাতিল করার কোন ক্ষমতা তো আমাদের নেই। জাতিসংঘকে আমাদের দরকার, অবশ্যই। তাই ওই বিশ্ব সংস্থা যেন নাখোশ না হয়, সেজন্য বিশ্ববাসীর এতাবৎকাল অজানা একটি তথ্য যে, বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডে আদিবাসী পরিচয়জ্ঞাপক কোন জনগোষ্ঠীসমূহের অস্তিত্ব নেই। ব্যস, বালাই ষাট, সরকার হিসেবে আর আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপনের ক্ষেত্রে আর আমাদের কোন নৈতিক দায়-দায়িত্ব রইলো না।

এই বিষয়টা নিয়ে ভেতরে এমন ক্ষোভ জমে আছে যে, এসব কথা অনেকবার বলার পরও প্রায় অনিবার্য অন্তর্গত তাড়নায় একই প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করে ফেলি। চট্টগ্রামে আমাদের ওই সহকর্মী এবং মারমাভাষী ছাত্রীর অনিন্দ্য কথোপকথনের বিষয়টা আমাকে আলাদা করে আলোড়িত করেছিল এবং ভিন্নধর্মী কিছু

পুনর্ভাবনায় প্ররোচিত করেছে। আমাদের আদিবাসী বন্ধুরা এবং আমরা যারা তাদের এই যৌক্তিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক বা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণমূলক সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি, আমরা কি এই আন্দোলনের পাশাপাশি অন্যতর কোন কার্যকর কর্মসূচির প্রতি মনোযোগ দিতে পারি?

আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে, এই দাবি নিয়ে অনেকদিন ধরেই কর্মতৎপরতা চলছে। তার কোন সুফল আসেনি। এবং যেহেতু এখন এমন কঠোর সরকারি (বা রাষ্ট্রীয়) বিবৃতি দেয়া হয়েছে যে, বাংলাদেশে কোন 'আদিবাসী' জনগোষ্ঠী অস্তিত্ব নেই, তাই এই আন্দোলন বহুব্যাপক ও বহুলকথিত 'দারিদ্র্য বিমোচন' কর্মসূচির মত অজ্ঞাত কালমেয়াদী একটা লক্ষ্যের পানে নিয়মানুগ যাত্রার সঙ্গে তুলনীয় বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। অথবা বিষয়টা বোধ হয় তার চেয়েও দুর্বল, কারণ, দারিদ্র্য বিমোচনে তো সরকারি বরাদ্দ বা কর্মোদ্যোগ আছে, দেশীয় অর্ন্তদেশীয় নানা কর্মসূচি ও প্রকল্প আছে, বিশ্ব ব্যাংক, আই এফ এফ, এডিবি এই সব সংস্থার অবিরত অবদান আছে। পরম অভাজন অনিকেত প্রায় ঠিকানারহিত আদিবাসীদের জন্য তো তেমন কোন কিছু নেই।

তাই সাংবিধানিক অধিকার চাই, সত্যসন্ধ ও সমব্যথী এবং কার্যকর ভূমি কমিশন চাই, মাতৃভাষায় লেখাপড়ার অধিকার চাই ইত্যাকার দাবি দাওয়া সম্বলিত ইস্তাহার বা সরকারের পদক্ষেপ এবং অনুগ্রহ-প্রত্যাশী কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্নমাত্রিক বেসরকারি উদ্যোগকে কার্যকর এবং অর্থবহ করে তোলার জন্য আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। আদিবাসীরা তো বাস্তব কারণে বাংলা ভাষাটা শিখেই নেয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা না শিখে এদেশে জীবনযাপন 'বাস্তব' অর্থেই সম্ভব নয়। আমরা বলছি, এবং তার মধ্যে যথার্থ যুক্তি আছে যে, মাতৃভাষায় পাঠদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী থেকে শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। অবশ্যই এটা ন্যায্য কথা। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিশুদের জন্য বাঙালি কিছু শিক্ষক কি ওই জনগোষ্ঠীর ভাষা শিখে নিতে পারেন না? আমার ওই সহকর্মী চাকমাদের সঙ্গে মিলেমিশে ওই ভাষাটা রপ্ত করেছেন। কিন্তু বাঙালি ও চাকমা/মারমা/ত্রিপুরীভাষী মিলে এইসব স্বল্পসংখ্যক মানুষদের ভাষাশিক্ষার জন্য একটা প্রয়োজনমাফিক কোর্স বানাতে পারি না? কাজটা খুবই সহজসাধ্য নয়, তবে আন্তরিকতা থাকলে তা নিশ্চয়ই একেবারে দুঃসাধ্য নয়। যদি তা করা সম্ভব হয়, আমি একজন একাডেমিক ব্যক্তি হিসেবে মনে করি, তা হলে ওই ভাষার স্থায়িত্ব নির্ধারণেও তা একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হতে পারে।

দ্বিতীয়ত, ওই ভাষাশিক্ষার কারণে বাঙালি আদিবাসী সমাজের মধ্যে ভিন্নতর একটা নৈকট্য রচিত হতে পারে। কঠিন হলেও এটা সত্য কথা যে, পৃথিবীর সব দেশেই সংখ্যালঘুরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক থেকে একটা দুর্বল অবস্থানে থাকে। সে আমেরিকার কালো হোক, পাকিস্তানের মোহাজের হোক, ভারতের মুসলমান বা মায়ানমারের রোহিঙ্গা, যেই হোক। তবে সংখ্যাগুরু/লঘু মিলে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক মৈত্রীভাবাপন্ন সমাজ গড়ার (একমাত্র মায়ানমার ব্যতীত) একটা উদ্যোগও এমন সব দেশে দ্রষ্টব্য। বাঙালি ও আদিবাসী মিলিতভাবে (কর্মরত বিভিন্ন এনজিও-র প্রকল্পের বাইরে) কিছু সামাজিক সংগঠন গড়ে ওঠা উচিত। বাঙালি শুধু 'বৈসাবি' অনুষ্ঠানের দর্শক হয়ে থাকবে না, তাতে আন্তরিক ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। তাদের মাতৃভাষায় পাঠদানকারী বাঙালি কোন শিক্ষক যেমন বাঙালিদের সদর্থকভাবে প্রণোদিত করতে পারেন আদিবাসীদের সঙ্গীত চর্চা করতে, তেমনি আমি বিশ্বাস করি, অনেক চাকমা/মারমা/গারো শিক্ষার্থী বেশ ভালভাবে গলায় তুলে নিতে পারে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা লালনের গান।

বাঙালি ও আদিবাসী মেলামেশায় প্রয়োজনীয় ঘাটতি থেকে গেছে। নিঃসন্দেহে এর নেপথ্যে অনেক সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণ আছে। দীর্ঘকাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সময় আমি আমার বিভাগীয় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের খুব উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলাম সব বিভাগের এমন ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মিলনে একটা সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তুলতে। সে চেষ্টায় সফল হইনি। আমার এমন একটা প্রতীতি জন্মেছিল যে, ওরা কোনভাবেই আমার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছে না। মোটামুটি লেখাপড়ায় ভাল, খাগড়াছড়ির এক ছাত্রকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম এসো দু'জনে মিলে Tales from the Hills নামে রাঙামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবানের লোককথার একটা সংকলন করি। সংগ্রহের কাজটা প্রধানত ছাত্রটি করবে, দু'জনে মিলে অনুবাদ করবো, আমি ভূমিকা লিখবো, প্রকাশের ব্যবস্থা করবো। আমার প্রিয় ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও (আমি ওদের বাড়িতে কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণও করেছিলাম) ওকে কার্যকরভাবে উদ্যোগী করে তুলতে পারিনি, ব্যর্থ হয়েছি।

বিষয়টা নিয়ে একান্ত ভেবেছি, এরকম মনে হয়েছে, সেই ষাটের দশকের কাপ্তাই হ্রদ খনন থেকে প্রীতিলতা চাকমার নিখোঁজ হওয়া এবং তারও পরবর্তী সময়ে আলফ্রেড সরেন হত্যা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আদিবাসীদের মনে এমন গভীর একটা বঞ্চনার ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে যে, ওরা প্রকৃত অর্থে আমাদের আর বান্ধব বলে মানতে পারছে না। তাই অন্য সব আন্দোলন ছাপিয়ে বাঙালি আদিবাসী সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নে আমাদের খুব সুপরিকল্পিতভাবে মনোযোগী ও তৎপর হতে হবে।

শফি আহমেদ
অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সঞ্জীব দ্রং

আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সেতুবন্ধন

এ বছর আদিবাসী দিবসের মূল সুর জাতিসংঘ নির্ধারণ করেছে 'ব্রিজিং দ্য গ্যাপ'। আমরা বঙ্গানুবাদ করেছি, আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সেতুবন্ধন। জাতিসংঘ স্বীকার করেছে ঐতিহাসিক কারণে আদিবাসী জনগণ বহু শতাব্দী ধরে নানামুখী শোষণ ও বৈষম্যের শিকার হয়েছে। তারা নিজ বাসভূমি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। আদিবাসীদের আত্মপরিচয়, ভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন। এসব কারণেই ১৯৯৩ সালকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আদিবাসী বর্ষ ঘোষণা করেছিল। সে সময় আদিবাসী বর্ষের মূলসুর ছিল "আদিবাসী জাতি: এক নতুন অংশীদারিত্ব"। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৯৪ সালে সিদ্ধান্ত ৪৯/২১৪ গ্রহণ করে ৯ আগস্টকে আদিবাসী দিবস হিসেবে পালনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে আহ্বান জানায়। জাতিসংঘ ১৯৯৫ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত প্রথম আদিবাসী দশক পালন করে। তারপর ২০০৫-২০১৪ সালের সময়কালকে দ্বিতীয় আদিবাসী দশক ঘোষণা করে যা এ বছর শেষ হতে চলেছে।

আদিবাসী দিবস উদযাপনের মূল লক্ষ্য হলো- আদিবাসীদের জীবনধারা, তাদের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার, আদিবাসী জাতিসমূহের ভাষা ও সংস্কৃতি তথা আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে সদস্য রাষ্ট্র, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, বৃহত্তর জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করে তোলা এবং আদিবাসী মানুষের অধিকারের প্রতি সমর্থন বৃদ্ধি করা।

প্রতি বছর আমরা বিশ্বের ৯০টি দেশের ৪০ কোটি আদিবাসী জনগণের মতো আমাদের দেশেও আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপন করি। অনেকবার কথা দিয়েও সরকারের নীতি নির্ধারণকারীরা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হয়েও এ দিবস রাষ্ট্রীয়ভাবে পালন করেননি। তবে আমরা আদিবাসীরা মহাসমারোহে আদিবাসী দিবস উদযপান করি আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রেরণার দিন হিসেবে। আমাদের দেশেও আদিবাসীদের মানবাধিকার পরিস্থিতি ভালো নয়। তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিলুপ্তপ্রায়। আদিবাসীরা দরিদ্রদের মধ্যেও দরিদ্রতম।

এ বছর আদিবাসী দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন তাঁর বাণীতে বলেছেন, 'আদিবাসী অধিকার ঘোষণাপত্রে আদিবাসীদের মর্যাদা ও অধিকারের জন্য ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। অনেক দেশে আদিবাসীদের সাংবিধানিক ও আইনগত স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। আবার অনেক দেশে তেমন স্বীকৃতি নেই, যেখানে আদিবাসীদের জীবন বিপন্ন। তিনি আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকল সদস্য-রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। বান কি মুন আরো বলেন, আসুন আমরা আদিবাসীদের মূল্যবান ও স্বতন্ত্র পরিচিতিকে স্বীকৃতি দিই এবং উদযাপন করি, আদিবসীদের ক্ষমতায়নে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়নের জন্য কঠোর পরিশ্রম করি।'

দুঃখের বিষয়, আমাদের রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য হয়েও আদিবাসী জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারেনি। এমনকি এখন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আত্ম-পরিচয়ের অধিকারকেও অস্বীকার করে আদিবাসীদের "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" বলে বিরামহীন অপমান করা হচ্ছে। নৃগোষ্ঠী মানে মানুষগোষ্ঠী। শব্দটি ভুল অথচ নিজেরা বিরোধী দলে থাকা কালে আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে দিয়েছে সরকার। কী দুর্ভাগ্য ও দুঃখ এখন আমাদের!

তবুও আমরা এবার আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠায় সেতু বন্ধন রচনার কথা বলেছি। আদিবাসী ও বাঙালি পরিচয়ের মধ্যে কোনো বিবাদ তো নেই-ই, বরং একে অপরের হাত ধরে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। আমরা বলেছি, আদিবাসীরা রাষ্ট্রের সঙ্গে সেতু বন্ধন রচনা করতে চায়। আমরা বৃহত্তর নাগরিক সমাজের সঙ্গে সেতু বন্ধন রচনা করতে চাই। নির্মল, সৎ ও সুন্দর সেতু বন্ধন রচিত হোক মুক্তিকামী গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সব মানুষের সঙ্গে। আদিবাসীরা হাত বাড়িয়ে চেয়ে আছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র আদিবাসীদের চোখ দিয়ে আদিবাসী অধিকারকে না দেখে উপেক্ষা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। আমি প্রশ্ন রাখছি, রাষ্ট্র তার নাগরিকদের পরিচয়, সংস্কৃতি বদলে দিতে পারে কিনা? সংখ্যার জোরে যদি আইনীভাবে পারেও, সেটি কি নৈতিকতা সম্পন্ন হবে? আমি রাষ্ট্রকে আদিবাসীদের অধিকার প্রশ্নে মানবিক হতে বলি। আমাদের রাষ্ট্র কবে আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জনগণের জন্য সংবেদনশীল ও অনুভূতিপ্রবণ হবে?

বাংলাদেশ বহু জাতির, বহু ভাষার, বহু সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সম্ভাবনাময় দেশ। বৈচিত্র্য মানে হুমকি নয়। আমরা বলি, বৈচিত্র্যেই সৌন্দর্য ও শক্তি। দেশের প্রায় ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার ৪৮টির অধিক আদিবাসী মানুষ স্মরণাতীত কাল থেকে এখানে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে আমাদের জীবন, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষা।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আদিবাসী জনগণের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। আদিবাসী দিবসে আমরা চেয়েছি আদিবাসী জাতীয় কমিশন গঠন করা হোক। আদিবাসী অধিকার রক্ষায় একটি আইন প্রণয়ন করা হোক। আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। সমতলের আদিবাসীদের জন্য ভূমি কমিশন গঠন করা হোক। পার্বত্য শান্তি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন আমরা চেয়েছি। বৃহৎ জাতিকে অনুরোধ করবো, সংখ্যায় ক্ষুদ্রদের অপমান, অবহেলা ও উপেক্ষার মধ্যে কোনো গৌরব নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেবলি করি অপমান।' কেন এমনটি হবে ? তাই আমি ফিরে যাই মহাশ্বেতা দেবীর কাছে। তিনি লিখেছেন, 'আদিবাসীদের সমাজব্যবস্থা, মূল্যবোধ, সংস্কৃতিচেতনা, সভ্যতা, সব মিলিয়ে যেন নানা সম্পদে শোভিত এক মহাদেশ। আমরা, মূলস্রোতের মানুষেরা, সে মহাদেশকে জানার চেষ্টা না করেই ধ্বংস করে ফেলেছি, তা অস্বীকার করার পথ নেই। মূলস্রোতের ধাক্কায় এদের বার বার দেশান্তরী হতে হয়েছে। ফলে অনেক কিছু গেছে হারিয়ে। মূলস্রোত এই বিষয়ে যে অপরাধে অপরাধী তার ক্ষমা নেই।'

বর্তমান সরকার ২০১০ সালে ৯ আগস্টকে 'জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস' ঘোষণা করে। এবার শহীদ মিনারে গিয়ে দেখি, সাদা টি-শার্ট পরা অনেক মানুষ। তাকিয়ে দেখি, সারি সারি সরকারি গাড়ি। সড়ক ছাপিয়ে গাড়ির বহর চলে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে। আমি সকালে গিয়ে ভেবেছিলাম কী হচ্ছে এখানে? পরে জানলাম ৯ আগস্ট জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস। এটি বর্তমান সরকার করেছে। অনেক আদিবাসী প্রশ্ন করেছেন, জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী দিবসের দিনটিকে জ্বালানী নিরাপত্তা দিবস না করে অন্য কোনো দিনে ৯ জুলাই বা ৮ আগস্ট বা ১০ আগস্ট করলে কী ক্ষতি হতো। এসব নানা যন্ত্রণা নিয়ে আদিবাসী সমাজ টিকে থাকার চেষ্টা করছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের আদিবাসীদের পাশে দাঁড়ানো উচিত। আমরা যেন ভুলে না যাই, আদিবাসীরা হারিয়ে গেলে অথবা মর্যাদাহীন অধিকারহীন কোনোরকমে টিকে থাকলে আমাদের রাষ্ট্র নিশ্চয় গণতান্ত্রিক বলে বিবেচিত হবে না। আদিবাসী অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘের মতো সকলের এগিয়ে আশা উচিত।

আদিবাসী ইস্যুতে পৃথিবীর অনেক দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। নরওয়েসহ স্ক্যানডিনেভিয়ান কয়েকটি দেশে আদিবাসী সামি পার্লামেন্ট আছে। আমরা তাদের উদাহরণ দিই। নেপালের কনস্টিটিউশনাল এসেম্বলিতে জনজাতিদের বড় ভূমিকা এবং ওদের সংসদের স্পীকার ছিলেন আদিবাসী লিমবু। এক সময় ভারতের স্পীকার ছিলেন মেঘালয়ের একজন গারো। মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ফিলিপাইন, জাপান, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম এরকম আরো অনেক দেশের উদাহরণ আমরা দিতে পারবো, যারা চেষ্টা করছেন আদিবাসীদের অধিকার প্রদানের। অস্ট্রেলিয়া সরকার অতীতের ভুল আচরণের জন্য পার্লামেন্টে আদিবাসীদের কাছে ঐতিহাসিক ক্ষমা চেয়ে বলেছে, 'এই ক্ষমা প্রার্থনা ও উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমরা একে অপরের যাতনা বুঝতে পারবো এবং সামনে অগ্রসর হতে পারবো।' দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আদিবাসী অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থনের বেলায়ও তারা শীর্ষে। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস আইমারা আদিবাসী সন্তান। নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দফতরে এসে একবার তিনি আদিবাসী পোশাক পরে ভাষণ দিয়েছিলেন। সেই ভাষণ শোনার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। হয়তো অনেকে কষ্ট পাবেন এই উদাহরণের জন্য যে, পাকিস্তানেও প্রভিন্সিয়ালি এডমিনিস্টারড ট্রাইবাল এরিয়া এবং ফেডারালি এডমিনিস্টারড ট্রাইবাল এরিয়া (পাটা ও ফাটা) আছে যা চিত্রল, দির, সোয়াট, খাইবার, কারাম, নর্থ ওয়ারিজিস্তান প্রভৃতি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। স্বশাসনের সবচেয়ে ভালো নমুনা হলো পূর্বাঞ্চলসহ ভারতের আদিবাসী অঞ্চলগুলো। আমরা কেন ওদের কাছ থেকে শিখবো না? আমরা কেন ওদের চেয়ে এগিয়ে থাকবো না?

তাই আশা করি, একদিন আমাদের রাষ্ট্র অনেক বেশি গণতান্ত্রিক ও মানবিক হবে। দেশে জাতীয় আদিবাসী কমিশন গঠিত হবে। একটি আদিবাসী নীতি থাকবে। সে নীতির মূল কথা হবে, আদিবাসী স্পর্শ বা ইনডিজিনাস টাচ। অসীম নম্রতা, শুদ্ধতা, হৃদয়ের বিশালতা ও সংবেদনশীলতা নিয়ে লেখা হবে সে আদিবাসী নীতিমালার বাক্যগুলো। তখন আইএলও কনভেনশন বাস্তবায়িত হবে আদিবাসীদের কল্যাণে। আমাদের সবাইকে মিলে-মিশে রাষ্ট্রকে তার সঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। আদিবাসী-বাঙালি সবার মধ্যে যোগাযোগের সংবাহন বিন্দু গড়ে তুলতে হবে। সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই, অথবা আকাশসীমার এক পৃথিবী রক্ত সবার লাল, অথবা কত ভাষা, কত বর্ণ, কত কথার ঢল, কান্দিলে সবার চোখে ঝরে একই জল, কথাগুলো সত্যি হবে। পাহাড়ি শিশুর হাত ধরে পরম আনন্দে পথ চলবে বাঙালি শিশু। শোষণ, বৈষম্য বলে কোনো শব্দ সমাজে আর থাকবে না। এখানে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-সুরমার সঙ্গে শঙ্খ-মাইনী-মেননেং-সীমসাং নদীকে মেলাবার কাজ শুরু হবে, জীবনে জীবন যোগ হবে।

শেষে ফিরে যাই অস্কারপ্রাপ্ত হলিউড ফিল্ম এ্যাভাটারের কাছে। বিখ্যাত সেই ডায়ালগ। নায়ক জ্যাক সুলি মেশিনগান আক্রমণে আহত, নায়িকা নিয়তিরি তার হাত ধরে গালে ছোঁয়ায়। জ্যাক বলে, আই সি ইউ। নায়িকা বলে, আই সি ইউ। আমি আজ বিশ্বাস করতে চাই, রাষ্ট্র আজ থেকে আদিবাসীদের বলবে, আই সি ইউ, আমি তোমাকে দেখি। আমরাও বলবো, আমি তোমাকে দেখি।

সঞ্জীব দ্রং
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম

ম থু রা বি কা শ ত্রি পুরা

শিক্ষা আইন ও আদিবাসীদের শিক্ষার অধিকার

ড. কুদরত এ খুদা থেকে শুরু করে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর হাত ধরে আমাদের সর্বশেষ প্রাপ্তি হলো ২০১০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি ও ২০১৩ সালে প্রণীত খসড়া শিক্ষা আইন। বাংলাদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ অগ্রগতি হলো এই খসড়া শিক্ষা আইন যা সংসদে চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রস্তাবনা ও প্রারম্ভিক কথা বাদ দিয়ে এই আইনে মোট পাঁচটি অধ্যায়ের অধীনে ৬৫টি ধারা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রারম্ভিকের তিনটি ধারায় সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন, সংজ্ঞা ও আইনের প্রাধান্য বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

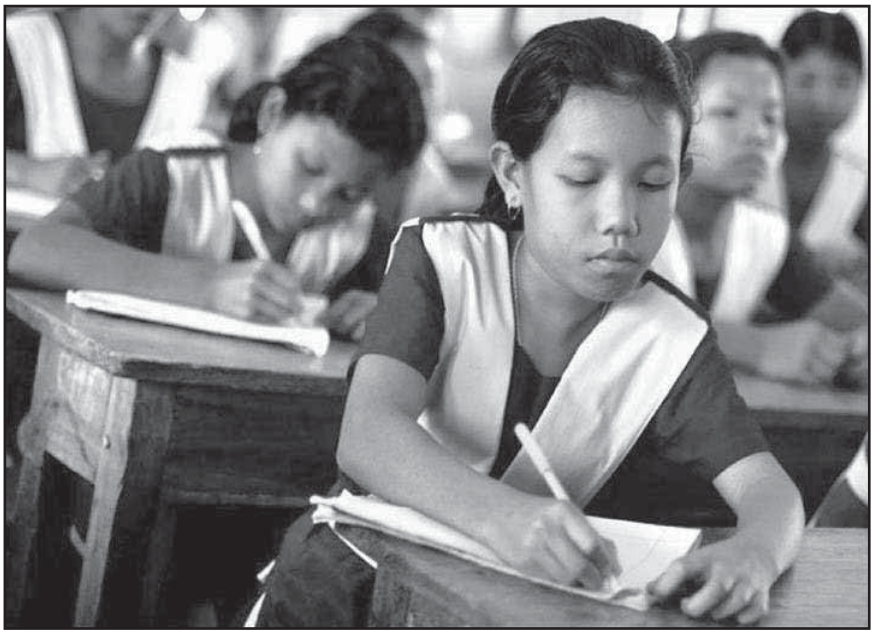

প্রথম অধ্যায়ে মূলত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিধানাবলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে যেসব বিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে, সেগুলো হলো- প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, নিরাপদ ও শিশুবান্ধব শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং এবতেদায়ি শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি, শিশুর ভর্তি নিশ্চিতকরণে বিদ্যালয়ের কর্তব্য, প্রাক-বৃত্তিমূলক ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও এবতেদায়ি মাদরাসা শিক্ষার জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক নির্বাচন, প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালনা পরিষদ, অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠন এবং প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা প্রশাসন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও জীবনব্যাপী শিক্ষার বিধানাবলি সন্নিবেশ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের ধারাগুলোর মধ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত সকল নারী-পুরুষের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে আইন বা বিধিমালা প্রণয়ন।

তৃতীয় অধ্যায়ে মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ে বিধানাবলি সন্নিবেশ করা হয়েছে, যার মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর, মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচি, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ধারাসমূহ (সাধারণ শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা, বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা), মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন ও স্বীকৃতি, মাধ্যমিক/দাখিল স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কর্তব্য, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, বিদ্যালয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক নির্বাচন, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মাধ্যমিক শিক্ষা প্রশাসন, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কমিটি ও অভিভাবক-শিক্ষক পরিষদ গঠন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। চতুর্থ অধ্যায়ে উচ্চ শিক্ষা

সংক্রান্ত বিধানাবলি যেমন- উচ্চ শিক্ষার স্তর, মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ, স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি ও কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের যোগ্যতা, প্রকৌশল শিক্ষা, মাদরাসা শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা, কৃষি শিক্ষা, ব্যবসায় শিক্ষা, আইন শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, নিবন্ধন, স্বীকৃতি গ্রহণ ও পরিচালনা, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, উচ্চ শিক্ষা স্তরের শিক্ষক নিয়োগ, উচ্চ শিক্ষা স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

'বিবিধ বিষয়াবলি' শিরোনামে পঞ্চম অধ্যায়ে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা, ক্রীড়া ও শারিরীক শিক্ষা, স্কাউট ও গার্ল-গাইড, বাংলা ভাষায় পাঠদান, শিক্ষার মান উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা, নেতৃত্ব সৃষ্টি, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণ, শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সেবা, অভিভাবক ও পিতা-মাতার দায়িত্ব-কর্তব্য, শিক্ষকদের কর্তব্য এবং অধিকার ও মর্যাদা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন/ জাতীয়করণ, এমপিও প্রদান ও পরিচলনা, বেতন-ভাতাদির সরকারি অংশ স্থগিতকরণ, কর্তন ও বাতিলকরণ, শিক্ষায় অর্থায়ন, সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্য, স্থায়ী শিক্ষা কমিশন, স্থায়ী শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব-কর্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিরীক্ষা, আইনের কার্যকারিতা, রহিতকরণ ও হেফাজতকরণ এবং বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত। আইনের শেষ পাতা তফসিল ১-এর আওতায় 'অপরাধ ও শাস্তি' শিরোনামে আইন অমান্যের ক্ষেত্রে আরোপিত দণ্ডসমূহ এবং অপরাধের বিচার ও আমলযোগ্যতা বিষয়ে আইনের বিবিধ বিধানাবলি উল্লেখ করা হয়েছে।

এই আইনে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়ে চার স্তরবিশিষ্ট শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে– প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ থেকে ৬ বছর। ৬ বছর বয়স থেকে শুরু হবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃতি ঘটানো হয়েছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি হবে মাধ্যমিক শিক্ষা। এরপর উচ্চ শিক্ষার স্তর।

গাইড, নোটবই এবং প্রাইভেট-টিউশনি ও কোচিং ব্যবসা বন্ধ করাসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কঠোর বিধান রাখা হয়েছে এই আইনে। আইনের বিভিন্ন ধারা লংঘনের ক্ষেত্রে ধার্য করা হয়েছে সর্বনিম্ন ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ১০ লাখ পর্যন্ত জরিমানা এবং ৬ মাস থেকে ১ বছর জেল অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান।

এই আইনের বিভিন্ন ধারায় আদিবাসী (সরকারি পরিভাষায় যাদেরেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন বিধানের কথা একাধিকবার উচ্চারিত হয়েছে। প্রাথমিক স্তরে স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা, এই শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক তৈরি, পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর অবদানের স্বীকৃতি, নমনীয় শিক্ষা পঞ্জিকা, পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর অনুমোদন নিয়ে স্থানীয়ভাবে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি বিষয় এই খসড়া আইনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

খসড়া আইনটি প্রণীত হওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে তা প্রদর্শন করে জনমত চাওয়া হয়েছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তিন পার্বত্য জেলার শিক্ষা সম্পর্কিত কাজে সম্পৃক্ত উন্নয়ন সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা তিন পার্বত্য জেলায় পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। পাশাপাশি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদও তাদের মতামত পাঠিয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর বিধান (ধারা ৫৩) অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও এখানকার অধিবাসীদের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের পরামর্শ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা নেওয়া হয়েছে কি না আমাদের জানা নেই। অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় দেশের একমাত্র মন্ত্রণালয় যা বিশেষ এলাকার নামে এবং ঐ এলাকার সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাই কেন্দ্রীয় যে কোন মন্ত্রণালয়ের পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই মন্ত্রণালয়কে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। কিন্তু এই আইন প্রণয়নের সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের কাছে মতামত চাওয়া হয়েছে কি না তা-ও আমাদের জানা নেই। আমাদের প্রেরিত কিছু কিছু সুপারিশ চূড়ান্ত খসড়ায় সন্নিবেশ করা হয়েছে দেখে আমরা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও এই আইন খসড়া করার কাজে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের কাছে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। সংসদে উঠার আগে এসব বিধানের উপর কাঁচি না পড়লেই কেবল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই কর্মযজ্ঞ অন্তিমে গিয়ে সফলতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

শিক্ষাবিদ, গবেষক, শিক্ষা অধিকারকর্মী ও উন্নয়ন সংগঠনগুলোর ফোরাম গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে. চৌধুরী এই আইনের খসড়া প্রণীত হওয়ার পরপর ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি অনলাইন পত্রিকার সাথে সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, 'এই শিক্ষা আইনে দেশের মানুষের

শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত হয়নি। আইনটি পর্যালোচনার দাবি রাখে।'

পার্বত্য অঞ্চলের শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যেসব সুপারিশ দিয়েছিলেন তার মধ্য হতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় চূড়ান্ত খসড়ায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বিষয়টি হয়তো কর্তৃপক্ষ আবারও বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্নিবেশ করা না হলে সত্যিকার অর্থে জনগণের শিক্ষার অধিকারের ন্যূনতম চাহিদাও এই আইন দ্বারা সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না।

যেসব বিষয় এই চূড়ান্ত খসড়ায় আমলে আনা হয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে, বাদ পড়ে যাওয়া কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরছি।

আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভাষা উন্নয়ন ও তদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলিতে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন কেন্দ্রীয় বিশেষায়িত সংস্থা নেই। তাই কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সংস্থা বা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। এই ইনস্টিটিউট আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের একটি বিশেষায়িত শাখা হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষার বিকাশ ও সংরক্ষণে অবদান রাখা, গবেষণায় ও প্রকাশনায় সহায়তা প্রদান, 'ডিপ্লোমা ইন এডুকেশন ইন এথনিক ল্যাংগুয়েজেস' কোর্স পরিচালনা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

পাঠ্যপুস্তকে কোন জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ভুলভাবে বা বিকৃতভাবে তুলে ধরা হলে ঐ জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে, যার দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতিকারক প্রভাব সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্রের উপর পড়বে এবং যা সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিরও পরিপন্থী এবং মৌলিক অধিকারসমূহের সাথে সম্পূর্ণ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, উপরোক্ত ভ্রান্তিসমূহ পরিহারের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিসমূহের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যপুস্তকে পাঠ্যবিষয় সম্পৃক্তকরণের সুবিধার্থে আদিবাসী জাতিসমূহের মধ্য হতে লেখক, গবেষক ও পাঠদানে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা অত্যন্ত জরুরি।

সরকারি অনুমোদন ও আর্থিক সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর জন্য শিক্ষা নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি 'বেসরকারি শিক্ষক নির্বাচন কমিশন' প্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রাথমিক খসড়া (২০১৩)-এর ১৩(৩) উপধারায় একটি বিধান ছিল। পার্বত্য জেলাগুলোর বেলায় প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলি যেহেতু পার্বত্য জেলা পরিষদগুলোর নিকট হস্তান্তরিত বিভাগ, সেহেতু এই শিক্ষক নির্বাচন কমিশনের কাজ এই তিন জেলার ক্ষেত্রে জেলা পরিষদগুলোই ভূমিকা পালন করতে পারে এই মর্মে একটি সুপারিশ আমরা করেছিলাম। কিন্তু চূড়ান্ত খসড়ায় এটিও এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালের খসড়ায় এই উপধারাটি ১৩(২) আকারে পূর্বের চেহারাতেই রয়েছে। ১৯৮৯ সালে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদগুলো গঠিত হওয়ার পর থেকেই তিন পার্বত্য জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ এই পরিষদগুলোই করে আসছে। তাই আইনের দ্বৈততা পরিহারের সুবিধার্থে এই উপধারাটি পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে।

পৃথিবীর নানা দেশে সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা ও চাকরিসহ নানা ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশেও নারী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীদের জন্য (উপজাতি কোটা নামে) এই কোটা ব্যবস্থার প্রচলন রয়েছে। খসড়া আইনের কয়েকটি ধারায় (ধারা ২২ গ/৬) বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও আদিবাসী শিশুদের জন্য বিশেষ করে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও উচ্চ শিক্ষায় কোটা সংরক্ষণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

চিকিৎসা শিক্ষার ক্ষেত্রে (ধারা ৩৬/৪) আধুনিক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার পাশাপাশি হোমিও, ইউনানি ও আয়ুর্বেদী চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। আদিবাসীদের প্রচলিত চিরায়ত চিকিৎসা পদ্ধতির ওপরও গবেষণাকর্ম পরিচালনাসহ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানা উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ থাকলেও এই বিষয়ে দেওয়া আমাদের মতামত আমলে নেওয়া হয়নি। অথচ আদিবাসী সমাজে প্রকৃতি হতে আহরিত সম্পদ ও চিরায়ত জ্ঞান ব্যবস্থাভিত্তিক বহু চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, যা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য সহায়ক হতে পারতো। কৃষি শিক্ষা ও আইন শিক্ষার ক্ষেত্রেও আদিবাসী জ্ঞানব্যবস্থা ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, যা এই আইনে আমলে নেওয়া হয়নি।

খসড়া আইনের (২০১৩) দু'টো জায়গায় আমরা স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাঙালি সংস্কৃতির পাশাপাশি দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাসহ অন্যান্য সংস্কৃতির জন্য ক্ষতিকারক বা পরিপন্থী বা কোন ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন কোন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞামূলক একটি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে (ধারা ২২/৪) তা আমলে নেওয়া হলেও কোন এক অজানা কারণে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে (ধারা ৪২/২) তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। আইনের এই ফোঁকর দিয়ে দেশের আদিবাসী জাতিসমূহের সমাজ, সংস্কৃতি, অস্তিত্ব ও বিশ্বাসের জন্য ক্ষতিকারক নানা কর্মকাণ্ড উচ্চ শিক্ষা স্তরের পাঠ্য

বিষয়গুলোতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই গেলো যেমনটি আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকে দেখে আসছিলাম, ২০১৩ সাল হতে যার কিছুটা সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ একটি বহু সংস্কৃতি, বহু জাতিগোষ্ঠী ও বহু ভাষাসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় দেশ। এদেশের প্রধান জাতিগোষ্ঠী বাঙালী ছাড়াও প্রায় অর্ধশতাধিক আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর লোকজন স্মরণাতীতকাল ধরে আপন কৃষ্টি, ভাষা, অস্তিত্ব ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে বসবাস করে আসছে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাঙালী সংস্কৃতির পাশাপাশি অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীগুলোর সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের পরিপন্থী কার্যক্রমের উপর বিধিনিষেধের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা না হলে এসব জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যা সম্পূর্ণভাবে দেশের সংবিধানের পরিপন্থী (২৩ ক)। তাই, এই ধারায় বাঙ্গালী সংস্কৃতির পাশাপাশি অন্যান্য জাতিসত্ত্বার সংস্কৃতির বিষয়টি উল্লেখ করা হলে দেশের সকল জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সমান মর্যাদায় টিকে থাকার সুযোগ পাবে। পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিকৃতভাবে উপস্থাপন হওয়া থেকে রেহাই পাবে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, আইনে এসব বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্তিই কি শেষ কথা? আইনে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হলেই কি আদিবাসীদের শিক্ষা গ্রহণের অধিকার নিশ্চিত হয়ে যাবে? না। চাই আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন। বাংলাদেশে বহু ইতিবাচক আইন ও কৌশল থাকলেও সেসব আইন ও নীতি-কৌশল বাস্তবায়ন নিয়ে রয়েছে নানা মত।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক ধীরগতি এবং জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে গৃহীত আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের ক্ষেত্রে অযথা দীর্ঘসূত্রিতা রাষ্ট্রীয় কর্মযজ্ঞগুলোর ব্যাপারে আদিবাসীদের সন্দেহ জাগ্রত করার ক্ষেত্রে উপস্থাপনযোগ্য উদাহরণ হিসেবে অত্যন্ত যথার্থ। এ দু'টো উদ্যোগের মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত সরকারি কার্যক্রমে আমাদের নানাভাবে সম্পৃক্ততা রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে, এমএলই ফোরাম হিসেবে, এনজিওকর্মী হিসেবে নানাভাবে এই কার্যক্রমের সাথে আমরা সম্পৃক্ত।

এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০১২ সালে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়, পরে একটি টেকনিক্যাল কমিটি ও একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক কমিটিও গঠন করা হয়। ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক চলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ২০১৩ সালের শেষার্ধ রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থায় কেটে যাওয়ায় একটি অজুহাত তৈরি হয়ে যায় এই কার্যক্রমের সূচনাকাল দীর্ঘায়িতকরণে।

২০১৪ সালে এই কার্যক্রমের সূচনাকারী আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় আসে এবং স্বাভাবিকভাবে আদিবাসী ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আন্দোলনে সম্পৃক্ত ব্যক্তি ও সংগঠনগুলো আশায় বুক বাঁধতে থাকে এবার বুঝি খুব দ্রুত গতিতে চলবে এই কার্যক্রম। কমিটির সভা হয় কয়েকটি, গঠিত হয় পাঁচটি আদিবাসী ভাষার লেখক-গবেষকদের নিয়ে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, সাদ্রি ও মান্দি ভাষার 'লেখক কমিটি', যেখানে প্রতিটি ভাষার ন্যূনপক্ষে পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হয়। তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে এই প্রক্রিয়ায় নানাভাবে সম্পৃক্ত করা হয়।

কিন্তু গত ২৩ আগস্ট ২০১৪ *প্রথম আলো*-তে প্রকাশিত সৌরভ সিকদারের একটি লেখা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর উৎসাহকে যেন ছাইচাপা দিয়ে দেয়। ঝুলে গেছে সরকারি এই কর্মযজ্ঞ! অগ্রসর হচ্ছে না নানা কারণে। তাহলে উপায়? হ্যাঁ, উপায় তো খুঁজতেই হবে আমাদের। কেবল আইন প্রণয়ন ও গ্রহণ নয়, সেসব আইন, নীতি ও কৌশলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের দিকেও নিবিড়ভাবে নজর দিতে হবে সরকারকে। যেন এক-দুইজন কর্মকর্তার জন্য এমন উদ্যোগ ঝুলে না যায় বা ভেস্তে না যায়। আকারে ক্ষুদ্র হলেও গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাগরিকদের অধিকার রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে না পারলে আমাদের এতো দিনের অর্জন ধুলোয় মিশে যাবে। সহস্রাব্দ লক্ষ্যের দৌড়ে বাংলাদেশের এই উপমহাদেশের বহু দেশের চেয়ে এখনও এগিয়ে রয়েছে। এই দৌড়ে আমরা যদি এগিয়েই থাকতে চাই তাহলে সচেতনভাবেই আমাদের কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করে যেতে হবে অব্যাহতভাবে। তা না হলে আমাদের চেয়ে পিছিয়ে থাকা দেশগুলো কচ্ছপের মতো পৌঁছে যাবে তাদের গন্তব্যে। আর এতটুকু অসতর্কতার জন্য খরগোশের মতো পিছিয়ে পড়বো আমরা।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা
নির্বাহী পরিচালক
জাবারাং কল্যাণ সমিতি

তথ্যসূত্র:

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০
২. শিক্ষা আইন (খসড়া) ২০১৩
৩. শিক্ষা আইন (চূড়ান্ত খসড়া) ২০১৪
৪. নতুন *বার্তা.কম*, ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩
৫. দৈনিক *যুগান্তর*, ১৫ আগস্ট ২০১৩
৬. দৈনিক *প্রথম আলো*, ২৩ আগস্ট ২০১৪

সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া

শিক্ষার মান

এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান সমুদ্রের সন্ধান দেয় এবং তথায় বিচরণে উদ্বুদ্ধ করে। বিখ্যাত চার্লস ডারউইন তার বিবর্তনবাদে বলেছেন, "মানুষ এক সময় ছিল মেরুদণ্ডহীন। লক্ষ কোটি বছরের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে, সে আজকের মত মেরুদণ্ড শক্ত এবং মজবুত করতে সক্ষম হয়েছে। এর পেছনে যে মূল শক্তি কাজ করেছে তা হলো শিক্ষা। প্রাচীন গ্রীকরা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এক স্বর্ণ যুগের সৃষ্টি করেছে। সক্রেটিস, প্লেটো, এরিস্টটল প্রমুখ দার্শনিকগণ শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানের যে অপূর্ব উন্মেষ ঘটিয়েছেন, তা সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। স্পেনের কৃতি সন্তানগণ জ্ঞান বিদ্যায় যে উৎকর্ষ ঘটিয়েছিলেন তা এখনো পৃথিবীর মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

শিক্ষাই যদি জাতির মেরুদণ্ড হয় এবং সে মেরুদণ্ডকে সোজা করে দাঁড় করাতে হলে শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে তার নীতি নির্ধারণ করতে হবে। পত্র-পত্রিকায় এবং সকল সংবাদে দেখা যায়, আমলারা আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে অতীব খুব কম গুরুত্ব দেন। সীমাহীন দুর্নীতির কারণে সমগ্র দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ আজ কলুষিত। নবম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী ইশতেহারে দেখেছি, শিক্ষা খাতে বরাদ্দে জাতীয় বাজেটে ৬%। অথচ বরাদ্দ ঘুরপাক খেয়েছে ২.১২-২.২%-এর মধ্যে। আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় সবচেয়ে কম। আমাদের দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদে উন্নত করতে শিক্ষার কোন বিকল্প নাই।

সংবাদপত্রে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১২ বছরে (প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) প্রায় ৬৫ ভাগ শিক্ষার্থীই ঝরে পড়েছে। এসব শিক্ষার্থীর মধ্যে ২৪ ভাগ প্রথম পাঁচ বছরে বা পঞ্চম শ্রেণীতে এবং পরের পাঁচ বছরে বা দশম শ্রেণী পর্যন্ত আরও ২৬ ভাগ ও বাকিরা একাদশ শ্রেণীতে ঝরে যায়। অথচ শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার স্বার্থে সরকার কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। বিনামূল্যে বইও দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে স্কুলে ধরে রাখার জন্য উপবৃত্তি দেওয়ার নামে অধিক অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়।

বিগত ৯ মার্চ ২০১৪ এক অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'শিক্ষিত জাতি গঠনে সরকার প্রতি বছর প্রাথমিক স্তর থেকে ডিগ্রী পর্যন্ত, প্রাথমিক স্তরে ৪০% এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ১ লক্ষ ৩৩ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করেছে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, এর পরও ১২ বছরে (উচ্চ মাধ্যমিক) ৬৫ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে কেন?

ঢাকায় বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছে, বাংলাদেশে প্রাথমিক স্তরের মোট শিক্ষার্থীর প্রায় ২৪ ভাগ, পঞ্চম শ্রেণীর দরজা পেরিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। আর বাকিদের মধ্যে, ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি দশ জনে যেতে পারে ৬ থেকে ৭ জন, আর মাত্র ৫ জন দশম শ্রেণীর সোপানে পৌছায়। এভাবে মাত্র ৩ থেকে ৪ জন কোনো শ্রেণীতে পুনরাবৃত্তি না করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর গণ্ডি পেরিয়ে যেতে পারে। বিশ্ব ব্যাংক আরও বলেছে, প্রথম শ্রেণীতেই কেবল ৭ ভাগ শিক্ষার্থী পুনরাবৃত্তির শিকার হয়ে থাকে। আর পঞ্চম শ্রেণীতে এই হার শতকরা ১০ ভাগ। রিপোর্টে বলা হয়েছে, স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে দরিদ্র ও অ-দরিদ্রের মধ্যে এখনও বড় ফারাক রয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমানে বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষায় দরিদ্রের অবস্থান, অ-দরিদ্রের চেয়ে ৩১ ভাগ নিচে। তবে প্রাথমিক স্তরে এই অর্জন কিছুটা হলেও নজর কেড়েছে। কিন্তু বিশেষ করে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ফারাক ব্যাপক। এতে স্কুলগুলোতে ধনী-দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য এবং ভাল ফলাফলের ক্ষেত্রেও তাদের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, প্রাক-প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার বাড়িয়ে শিখনের অসমতা দ্রুত কমিয়ে আনা প্রয়োজন। যদিও এই স্তরে শিশুদের হার বাড়ছে, তারপরও তাদের ভর্তির হার অনেক কম। এই হার মাত্র ২৩ ভাগ। বিগত ৩রা মার্চ-২০১৪, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের শিক্ষাখাত নিয়ে প্রকাশিত এই পর্যালোচনা প্রতিবেদনে শিক্ষার সঙ্গে দেশের শ্রম শক্তির সম্পর্ক এবং অর্থনীতিতে এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর গড়ে ১৩ লক্ষ শ্রমিক নতুন করে যুক্ত হচ্ছে। মোট শ্রম শক্তির সাড়ে ৮৮ শতাংশই

আনুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। এরা মূলত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরাই এই শ্রমশক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। আর গ্রামের প্রায় অর্ধেক বা ৪৫% শতাংশ শ্রমিকের কোন ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা নাই। এ চিত্র শহরে কিছুটা ভাল, প্রায় ২৮ শতাংশ। বিশ্বব্যাংক বলেছে, স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত শিক্ষার্থী মূলত দরিদ্রতার কারণেই স্কুলের বাহিরে থেকে যাচ্ছে। এ কারণে শিশুদের ঝরে পড়ার হার বেশি। দারিদ্র্য দূর করা বাংলাদেশের জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে মনে করেন সংস্থাটি।

পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে পাশের হার ভাল বললে কিছুই বলা হয় না, খুব ভাল, এমনকি অবিশ্বাস্য রকমের ভাল। ফলগুলোতে পাশ ও জিপিএ ৫ প্রাপ্তির সংখ্যা বাড়ছে। গত বছরের প্রাথমিক সমাপনী ও জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পাশের হার শতভাগ। এ বছরে (২০০৪) এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অকৃতকার্য হয়েছে মাত্র ৮.৫ শতাংশ। আর জিপিএ ৫ পেয়েছে, ১ লক্ষ ৪২ হাজার ২৭৬ জন। সাফল্যের এই ঊর্ধগামিতা নিয়ে স্বভাবতই মনে নানা রকম প্রশ্নের উদয় হয়। এটাই কী প্রকৃত চিত্র, না কৃত্রিম? কারণ, এই জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের বেশীর ভাগই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় নূন্যতম নম্বরও পাচ্ছে না। চাকুরীর বাজারে গিয়েও তাদের হতাশ হতে হচ্ছে। এ অবস্থায় পাশের হার বাড়লেও শিক্ষার গুণগত মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। শিক্ষাবিদেরা। জাতি গঠন ও উন্নয়নের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে শিক্ষা। আর শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়গুলো হচ্ছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাঙ্গন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার পরিবেশ ইত্যাদি। তবে এ প্রসঙ্গে শিক্ষকের ভূমিকাই মূখ্য। কেননা, শিক্ষকই হচ্ছেন শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মূল চালিকাশক্তি। আমাদের দেশে শুধু প্রচারে শিক্ষার প্রসার ঘটছে, কিন্তু শিক্ষার মান ক্রমশ নিম্নমুখী হচ্ছে। এর প্রধান কারণ, শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করেছে, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অপসংস্কৃতি ও অপরাজনীতি।

সভ্যতার বিকাশে, শিক্ষাঙ্গনই হচ্ছে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীদের নিকেতন এবং একমাত্র মেধা বিকাশ ও পরিচর্যার আর্দশ ক্ষেত্র। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষকদের কর্তব্যনিষ্ঠা, নিরলস শ্রমশীলতা ও নিয়মনীতির শৃঙ্খলাবোধ হয়ে উঠে প্রেরণার উৎস। এক কথায় বলা যায় শিক্ষাঙ্গন হল সুশিক্ষিত, জ্ঞানবান ও দক্ষ মানুষ গড়ার কর্মশালা। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে দেখা যায় এর বিপরীতমুখী চিত্র। অর্থাৎ অনেকক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গন জ্ঞানকেন্দ্রিক না হয়ে, হয়েছে অর্থকেন্দ্রিক। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, আবার কোথাও শিক্ষা কার্যক্রম সেশনজটে জর্জরিত।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে অপরাজনীতির অন্তরালে, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চলে এবং সন্ত্রাসীরা অপরাজনীতির আশ্রয়ে, তাদের ঘৃণ্য কার্যকলাপ চালিয়ে শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করেছে। এমতাবস্থায় মানসম্মত শিক্ষার কথা দূরে থাকুক, স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে বিশ্বমানের শিক্ষা থেকে আমরা ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছি। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, প্রয়োজন শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সব ধরনের বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অপরাজনীতির অনুপ্রবেশ দূর করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা। এক কথায় বলা যায়, 'শিক্ষার জন্য শিক্ষাঙ্গন'। এ জন্য বিকল্পহীনভাবে প্রয়োজন সরকারের নীতিনির্ধারকসহ সব রাজনৈতিক দলের সদিচ্ছা এবং প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহায়তা।

শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় কোন রকমের বৈষম্য থাকা উচিত নয়। শিক্ষাখাতে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে অবিলম্বে সরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের, অনুরূপ বাড়ি ভাড়া, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, মেডিকেল ভাতা, উৎসব ভাতা, পদোন্নতি এবং মেধাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের জন্য নির্ভেজাল শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠন করে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

উচ্চ শিক্ষার বিপজ্জনক ভবিষ্যত এবং মান উন্নয়নের ব্যাপারে সম্প্রতি টিআইবি-এর গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, কিভাবে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকেরা প্রতারিত হচ্ছে। কিভাবে সার্বিক উচ্চ শিক্ষার মানের চরম অবনতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়েছে।

সর্বোপরি, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন দ্রুততর করার যে প্রত্যাশা জেগে উঠেছিল, তা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তত ৬০ ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়ম হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দেখভাল করার দায়িত্বে থাকা, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসব অপরাধ করেছে। একেই বলে সর্ষের মধ্যে ভূত। বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদনের জন্য কমপক্ষে ১-৩ কোটি টাকা খরচ করতে হয়। তাই অনুমোদন পাওয়ার পরই তারা বিভিন্নভাবে ঐ টাকা কামাইয়া নেয়। অথচ আইনে আছে, এটি হবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তদের প্রায় ৩০ শতাংশই ব্যবসায়ী। প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে অতিরিক্ত বেতন ও সুযোগ সুবিধা দিয়ে, ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্যসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে অবসরপ্রাপ্ত আমলা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রভাবশালী ব্যক্তিকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার উদাহরণও আছে। ক্লাস না করে, পরীক্ষা না নিয়ে ও ব্যবহারিক

ক্লাস না নিয়ে, টাকার বিনিময়ে ভুয়া সার্টিফিকেট প্রদান, মনগড়া অডিট রিপোর্ট তৈরি, ভিসি, প্রোভিসি ও ট্রেজারার নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া, অভিযোগ নিষ্পত্তি, পরিদর্শন রিপোর্ট, অনুষদ, বিভাগ ও পাঠ্যক্রম অনুমোদনসহ বিভিন্ন খাতে চাহিদামত কাজ পেতে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়।

আইন অনুযায়ী শাখা ক্যাম্পাস নিষিদ্ধ হলেও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪০টি পর্যন্ত শাখা ক্যাম্পাস রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়েও তাদের শাখা রয়েছে। টিউশন ফি বাবদ একজন শিক্ষার্থী প্রতি বছর গড়ে ৭৮ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হয়। বিনিময়ে কী শিখেছে শিক্ষার্থীরা। তবে কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এর বিপরীত চিত্রও আছে। সেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাল শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা পাশ করে দেশ-বিদেশে ভাল চাকুরী পাচ্ছে, সুনাম অর্জন করছে।

বিশ্বব্যাংক এর বিগত ৩০শে জুন ২০১৪ প্রকাশিত এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে স্কুল শিক্ষার নিম্নমান নিয়ে হতাশা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা পদ্ধতিরও সমালোচনা করেছে। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সঠিক অবদান রাখার লক্ষ্যে শিক্ষার হার দ্রুত বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আমাদের দেশে বর্তমানে নিম্নশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা শিক্ষার মানই ধরে রাখা যাচ্ছে না।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যাওয়া নিয়ে সম্প্রতি শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষা ব্যবসায়ীদের দৌরাত্মে তিনি অতিষ্ঠ। প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা ব্যর্থতার দায়ী কিনা, সেই প্রশ্ন না করেই বলা যায়, সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের চেয়ে, শিক্ষা ব্যবসায়ীরা বেশি শক্তিশালী হয়ে পড়েছে। তাই উচ্চশিক্ষার নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে চলে গিয়েছে। এ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকারকে মজবুতভাবে নড়েচড়ে বসতে হবে।

টিআইবি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্নীতি ও অনিয়মের তথ্য প্রকাশ করেছে। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যে খুব ভাল চলছে, তা কিন্তু জোর করে বলা যায় না। বেশিরভাগ শিক্ষক নিয়মিত লেখাপড়া করে ক্লাসে পাঠদান করার পরিবর্তে দলবাজি করে, একাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টাকার বিনিময়ে ক্লাস নেওয়া, সরকারি-বেসরকারি বিদেশি প্রতিষ্ঠানে কনসালটেন্সি করায় ব্যস্ত থাকেন। অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণের চেয়ে আয় রোজগারকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। দেশে বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার্থীর ৫৫ শতাংশই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। প্রতি বছরই এ সংখ্যা বাড়ছে। তাই বিকল্পহীনভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জনের সুষ্ঠু পরিবেশ যত দ্রুত সম্ভব ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্য সরকারকে মুখ্য এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। টিআইবি'র রিপোর্টে উচ্চশিক্ষাকে প্রশ্নবিদ্ধ ও কলুষিত করার অপচেষ্টা হিসেবে না দেখে, এটাকে একটা সর্তক সংকেত হিসেবে নেয়াই উত্তম। সরকারকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনটির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আইন অনুযায়ী একটি জাতীয় স্বতন্ত্র স্বাধীন ত্রক্রিডিটিশন কাউন্সিল অতি দ্রুত গঠন করতে হবে। যারা আইনের প্রতিপালন নিশ্চিত করবে।

বিগত ১৫ জুলাই ২০১৪ *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর প্রথম পৃষ্ঠায়, লাল বড় হরফে লেখা, জাল সনদের শিক্ষক। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই জাল সনদ সংগ্রহ, ভর্তি, চাকুরী লাভ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যবহার বিস্তর হচ্ছে কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে। ক্ষমতাবানদের ছত্রছায়ায় এই গর্হিত কাজে নাকি জড়িত রয়েছে বিভিন্ন বিভাগ এবং প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিবর্গ। আজ সারা দেশের শিক্ষাঙ্গনে এবং প্রতিষ্ঠানে এই দুর্নীতি এবং অনিয়ম বিরাজমান। এটা সমগ্র জাতির জন্য শুধু দুর্ভাগ্য এবং কলঙ্কময় নয়, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক বিপর্যয়।

জাল সনদের এই অশুভ ঘটনাটি শুধু শিক্ষা ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নাই, বরং সকল প্রতিষ্ঠান, দপ্তর, বিভাগ এবং রাষ্ট্র অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে একটা মহা বিপর্যয় ঘটছে। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে সমাজ, নাগরিক, শিক্ষিত মহল, সচেতন মধ্যবিত্ত ও সুশীল সমাজ সকলে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। দুর্নীতি, অনিয়ম এবং মানের অর্ধোগতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন গর্হিত বিষয়গুলি ব্যবস্থার অভ্যন্তরে দানা বেঁধে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। আজ প্রয়োজন চরিত্রবান, সৎ সাহসী, উদ্যমী, ধৈর্য্যশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বের।

উপরে উল্লেখিত বিপর্যয় ঠেকাতে, আজ সরকারকে পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের দিকে জরুরী ভিত্তিতে নজর দিতে হবে। একই সাথে প্রয়োজন ব্যক্তির চরিত্র শুদ্ধি। এ সংস্কারের উদ্দেশ্য যেন কোনভাবেই কালাকানুনমূলক সরকারি নিয়ন্ত্রণ না হয়। এ ছাড়াও জ্ঞান পিপাসু শিক্ষকেরা যেন সম্মানজনকভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন, তাও নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার জন্য শিক্ষাঙ্গন এর বাস্তবায়ন যেমন অপরিহার্য, তেমনি বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে।

পরিশেষে এটা জোর দিয়ে বলা যায়, এতে প্রয়োজন চরিত্রবান, সৎ, সাহসী, উদ্যমী, ধৈর্য্যশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্বের। যদি সর্বোচ্চ স্তরে নিবেদিতপ্রাণ, যোগ্য নেতৃত্ব এবং মধ্যম সারিতে আগ্রহী যোগ্য এবং দেশপ্রেমিক আর নীচের সারিতে আন্তরিক কর্মচারী পাওয়া না যায়, তাহলে সত্যিকার উন্নতি কিছুতেই সম্ভব নয়।

সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং কৃষি উপদেষ্টা

কুমার প্রীতীশ বল

সবার আগে চাই জুম্ম জনগোষ্ঠীর আনন্দ বেদনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

এক

পার্বত্য চট্টগ্রামের পাঁচ হাজার পঁচানব্বই বর্গমাইল এলাকাজুড়ে যে এগারোটি জাতিসত্তার বসবাস, তাদের সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষাধিক। ১৪০৫ বঙ্গাব্দের শেষ সপ্তাহে রাঙামাটিতে এদের প্রত্যেকের সঙ্গে না হলেও পাঁচ দিনে এগারোটি জাতিসত্তার প্রায় অর্ধশত প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমি এখানে যাই মূলত, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধ্বংসোন্মুখ আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের নিজস্ব উদ্যোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং সরকারি, বেসরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কাছে আদিবাসীদের প্রত্যাশা এবং করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে। এসময় সামাজিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সাংস্কৃতিক কর্মীদের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার বেদনাহত কাহিনি শুনতে শুনতে এক সময় আমাদের চোখও অশ্রুসজল হয়ে যায়। নিজেদের অর্থনৈতিক দূরাবস্থার কথা বলতে গিয়ে চাক জাতিসত্তার প্রতিনিধি চিংলা মং চাক বলেন, 'আমি একজন শিক্ষক। আমি এই আদিবাসী সংস্কৃতি মেলা' ৯৯-এর দল নিয়ে এসেছি বিঝু উপলক্ষে প্রাপ্ত বোনাসের টাকা খরচ করে। জানি না, বাড়ি গিয়ে কীভাবে বিঝু পালন করব। স্ত্রী-সন্তানকে কী জবাব দিব।' ধ্বংসোন্মুখ আদিবাসী সংস্কৃতিকে বিকাশমান করতে পার্বত্য জনপদের প্রায় ৭ লক্ষাধিক জুম্মজনগোষ্ঠী পথের অন্বেষণ করে চলেছে। এক্ষণে এদের আনন্দবেদনার বিশ্বস্ত সঙ্গী হয়ে তাদের চাহিদাভিত্তিক উন্নয়নের পথ সন্ধানে আমরাও যদি আন্তরিক ভূমিকা রাখতে পারি, তবেই সেখানে শুরু হতে পারে শান্তি ও সম্প্রীতির নতুন এক অভিযাত্রা।

দুই

পার্বত্য জনপদে এর আগেও আমি অনেকবার গিয়েছি। কিন্তু শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর যাওয়াটা ছিল তাৎপর্যমণ্ডিত। চৈত্রের রৌদ্রকরোজ্জ্বল কিংবা ঘনঘোর অমানিশায় রাত গভীরে (রাত ১২টা-১টা) রাঙামাটির পাহাড়ী জনপদে চলতে গিয়ে এতটুকু ক্লান্তি কিংবা ভয় আমার ভেতরে কাজ করেনি। অতীতে যা নাকি আমার না হলেও আমাদের স্বজন কিংবা গুণগ্রাহীদের ভেতর প্রচ্ছন্নভাবে হলেও ছিল। কিন্তু নিজের স্বস্তির দিকটা নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করলাম, এখনো প্রতিটি জাতিসত্তা আশা-নিরাশার দোলাচলে বন্দি। এসব শান্ত, সজীব, উদারনৈতিক মানুষগুলো মুখ ফুটে যা কিছু প্রকাশ করছে, তার চেয়েও অনেক বেশি অনুচ্চারিত থেকে যাচ্ছে। ওরা এখনো ছাদ ফাটিয়ে হাসে না, বিলাপ করে কাঁদেও না। কারণ ওরা এখনো ভুলতে পারেনি, একদিন এই নিকট অতীতেই 'তাদের জীবন থেকে জীবন হারিয়ে গিয়েছিল, স্বপ্নহীন হয়ে পড়েছিল তারা। পাহাড়, অরণ্য, নদী, ঝর্ণা, রাঙামাটির হ্রদের পানি, ঘর, উঠান, জমি, বাগান, বাগিচা, পায়ে চলার বুনো পথ, কেয়াং, মন্দির, জুম ক্ষেত, মাচাং ঘর, গ্রাম, সংগীত, উৎসব সবকিছু অশুচি-অপবিত্র হয়ে গিয়েছেল। নোংরা রাজনীতি ও বহিরাগত বাঙালি পুনর্বাসনের মাধ্যমে পাহাড়ীদের জীবন হয়ে পড়েছিল দূষিত'। (সঞ্জীব দ্রং), এখনো, শান্তিচুক্তির পরও সেই কালিমার ছাপ ওদের চোখের সামনে জ্বলজ্বল করছে। বারুদের ঝাঁঝালো গন্ধে একদিন জুম্মজনগোষ্ঠীর জীবন থেকে যে গেংখুলীরা বিদায় নিয়েছিল, তারা আজও ফেরেনি। অথচ আমাদের মায়েরা, আমাদের পিতারা এখনো তাদের অপেক্ষায়। তাঁরা আর্তস্বরে বিলাপ করছে, আমাদের গেংখুলীরা ফিরে আসুক। রাধামন ধনপুদি পালা, নরধন নরপুদি পালার মতো আবারও গেংখুলীরা নতুন পালা গান বাঁধুক। যেখানে পাহাড়ী জনপদের সুঠাম কান্তি মানুষের বীরত্বগাথা, সমাজব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণের কথাই শুধু থাকবে না। আরও থাকবে পার্বত্য জনপদের প্রতিটি জাতিসত্তার উন্নয়নের প্রাসঙ্গিক ভাবনা।

তিন

উন্নয়নের পূর্বশর্ত যদি হয় পারস্পরিক বিশ্বাস অর্জন, আস্থা স্থাপন, তবে পার্বত্য জনপদে তা এখনো অর্জিত হয়নি। যদি এই অর্জন অপূর্ণ থাকে, যদি 'দেবে আর নেবে মিলাবে মেলাবো'– এই গীতবাণী বাঙালিসহ প্রতিটি জাতিসত্তার ভেতরে সমস্বরে সঞ্চারিত না হয়, তবে কখনোই পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের পুষ্পকরথ তর তর বেগে এগিয়ে যাবে না। আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নানা ধরনের সন্দেহ কিংবা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের যথেষ্ট ক্ষেত্র বিগত সময়ে প্রস্তুত হয়েছে, যা কিনা এখনো কঠিন শীলার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে।

রাঙামাটি শহরে ঢুকতেই চোখে পড়ে সার্কিট হাইজ, ক্যান্টনমেন্ট এলাকা। একদা এ অংশের নাম ছিল 'ভেদভেদি'।

'ভেদভেদি'-একট চাকমা শব্দ। এর অর্থ 'বুদবুদ'। 'ভেদভেদি' নদীর নামানুসারে এ এলাকার নাম হয় 'ভেদভেদি'। কথিত আছে, দৈত্যরাজ অবস্থা বেগতিক দেখে মাটি ফুঁড়ে পাতলপুরীতে গিয়ে

লুকায়। এতে সেখানে বহুদিন মাটি ফুঁড়ে বুদবুদ উঠে একটি নদীর সৃষ্টি হয়। আর সে নদীর নাম হলো 'ভেদভেদি।'

কিন্তু বাঙালি পুনর্বাসনের সময়ে জনৈক মেজর আমানতের নাম স্মরণে রাখতে 'ভেদভেদি' এলাকার নাম হয়ে যায় 'আমানত বাগ'। এমনিভাবেই জুম্মজনগোষ্ঠীর মতামতকে উপেক্ষা করে 'আলীয়াকেদম' একদিন প্রত্যূষে হয়ে গেল 'আলীকদম'। অথচ এসকল পাহাড়ি জনপদের নামের সঙ্গে শুধু চাকমা নয়, এগারোটি জাতিসত্তার নানান জানা-অজানা জীবনকথার যোগসূত্র রয়েছে। এভাবে বিভিন্ন জনপদের কিংবা প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনের যে বেদনা জুম্মজনগোষ্ঠীর বুকের ভেতর তুষের আগুনের মতো জ্বলছে, তা অতিসত্বর নিভানো না গেলে অবশ্যই ঐ জনপদের উন্নয়নের জয়যাত্রা বিঘ্নিত হবে।

চার

জুম্মজনগোষ্ঠীর নারীদের মধ্যে পর্দা প্রথার কোনো প্রচলন নেই। লেখাপড়া থেকে শুরু করে উৎপাদন পর্যন্ত জুম্মু নারী-পুরুষ ঐক্যবদ্ধভাবে সকল কাজ সম্পাদনে অভ্যস্ত। তাই পাহাড়ী জনপদে মহিলা শিক্ষালয় স্থাপন জুম্মজনগোষ্ঠী মানতে পারছে না। এটাকে তারা তাদের 'জেন্ডার' কনসেপ্ট ধ্বংসের পাঁয়তারা বলে ধরে নিচ্ছে। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে চৈত্রের শেষ সপ্তাহে এক তপ্ত দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী উত্তেজিত, ক্ষুব্ধ, অভিমানী যুবক সুখেশ্বর চাকমা পল্টু আমাকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শুনিয়ে দিলেন, চাকমা বা অন্য আদিবাসী ভাষায় 'ধর্ষণ' শব্দটাই আপনি পাবেন না। কারণ এ ধরনের কোনো ঘটনাই আদিবাসীদের মধ্যে কখনো ঘটে না। শুধু তা নয়, বিগত দিনে শত শত আদিবাসী নারী বাঙালিদের হাতে ধর্ষিত হলেও কখনোই একজন আদিবাসী পুরুষ একই ধরনের অপকর্ম করেনি। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আদিবাসীদের জাতিসত্তাগত নৈতিকতার এই দৃঢ়তা আমাদের মধ্যে সামান্যটুকুও প্রভাব ফেলেনি। তাই সেদিন সুরেশ্বর চাকমার সেই প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণের সামনে নিজেকে নিতান্তই কাপুরুষ, পিশাচ, দানব এবং লজ্জিত বোধ হয়েছে। কারণ আমরা যদি তাদের কাছ থেকে অন্তত এই একটা নৈতিক দৃঢ়তা অর্জন করতে পারতাম, তবে আমাদের শাজনীন আর খুন হতো না। আমাদের সীমা নিহত হতো না। মার বুক খালি করে নূরজাহান হারিয়ে যেত না। নারীর প্রতি এই সম্মানটুকু আমরা এখনো প্রদর্শন করতে পারিনি।

পাঁচ

সমতল ভূমির উন্নয়ন পদ্ধতির সঙ্গে পাহাড়ী জনপদকে মিলালে সমস্যা হতে পারে। জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি ঝিমিত ঝিমিত চাকমার ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া আমাদের জানান দেয়, উন্নয়ন কর্মসূচির কারণে পাহাড়ি জনপদের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। আগে অরণ্যের ঝর্ণার শীতল পানি পান করে তৃষ্ণার্ত জুম্মজনগোষ্ঠী পিপাসা মিটাত। এখন তা আর সম্ভব হচ্ছে না। আধুনিক উপায়ে বনায়নের নামে প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট বন, জঙ্গল নির্বিচারে ধ্বংস করা হচ্ছে। এর ফলে একে একে চাপা পড়ে যাচ্ছে প্রাকৃতিক ঝর্ণার উৎসমুখ। ঝিমিত ঝিমিত চাকমার এই অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তবে তা হয়ে উঠবে আমাদের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে ভয়াবহ এক অশনিসংকেত। এখানে তখন আধুনিকতা হবে মারাত্মক এক অভিশাপ। এ থেকে সমতল ভূমির অধিবাসীরাও রেহাই পাবে না। এসব কারণে উন্নয়নের কথা শুনে জুম্মজনগোষ্ঠী যদি ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকায়, তবে কী করে তাদের আমরা অভিসম্পাত দেব? আবার এতদিনে যদি এদের মধ্যে কোনো ভুল ধারণা জন্ম নিয়ে থাকে, তার জন্যও এই আমরাই দায়ী। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কাজ হওয়া উচিত, এই ভুল ভাঙানো।

ছয়

'সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও আদিবাসী সংস্কৃতি' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা উপলক্ষেই বস্তুত একবার রাঙামাটি গিয়েছিলাম। এই কর্মশালায় চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, বম, চাকসহ এগারটি জাতিসত্তার প্রতিনিধিদের মধ্যে একটাই আকুতি ফুটে উঠেছে, 'আমরা শিক্ষা চাই'। যদিও-বা জাতিগত দিক থেকে বিবেচনা করলে চাকমাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বেশি। কিন্তু তাদের অভিন্ন আকুতি আমাদের খুবই বিচলিত করে। এদিন আরও একটি বক্তব্য জোরালোভাবে উচ্চারিত হয়েছে, 'আমরা আমাদের ভাষা, বর্ণমালা, সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং বিকাশ চাই।' যদিও তারা জানে, বাংলাকে অস্বীকার করে সাক্ষরতা অর্জন অসম্ভব। সেদিন এদের কথা শুনে বোধ হয়েছে, সাত লক্ষাধিক জুম্মজনগোষ্ঠী অধ্যুষিত পাহাড়ি জনপদে বাংলা লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ভাষার অধিকারের দাবিতে একদিন এ জনপদের মানুষ বুকের রুধিরে (রক্তে) রাজপথ রঞ্জিত করেছিল। বাঙালির মাতৃভাষার অধিকার আদায়ের সংগ্রামের কাহিনী সাত লক্ষাধিক জুম্মজনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অজানা থাকার কথা নয়। ওই কারণেই তারা তাদের ভাষা এবং বর্ণমালা চর্চার সুযোগ দাবি করছে। তারা তাদের ভাষায় জাতীয় সংসদে বক্তৃতা দিতে চায়নি। এরা নিজেদের ভাষায় মাকে মা ডাকে না, মা তার সন্তানকে ঘুম পাড়ায় না, যে ভাষায় ওরা স্বপ্ন দেখে না, সে ভাষাকে কতটুকুই আর আপন করে নেওয়া যায়? এই কর্মশালায় ভাষা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উচ্চারিত হয়েছে আরও অনেক রূঢ় সত্য। আদিবাসী সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে কর্মশালা থেকে যে ছয়টি সমস্যা চিহ্নিত হয়, সেগুলো হলো–

১. বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাব
২. শিক্ষিত আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে হীনমন্যতা
৩. শিক্ষার ক্ষেত্রে আদিবাসীদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা
৪. অর্থনৈতিক অসমতা
৫. প্রচার মাধ্যমের অসহযোগিতা
৬. সাংস্কৃতিক সংগঠনের অপ্রতুলতা

এসকল সমস্যা সামাধানের লক্ষ্যে সুপারিশসমূহ হলো নিম্নরূপঃ

ক. সরকারের করণীয়

১. উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটকে (ইসাই) একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে পর্যাপ্ত মঞ্জুরি প্রদান। প্রতিটি থানায় উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

২. আদিবাসীদের জন্য পৃথক শিক্ষাবোর্ড গঠন এবং আদিবাসী ভাষা, বর্ণমালা, ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি পাঠ্যক্রম অন্তর্ভুক্তি

৩. আদিবাসী আইন ও প্রথাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান

৪. আই.এল.ও. কনভেনশন ১০৭-এর যথাযথ প্রয়োগ

৫. আদিবাসীদের জন্য পৃথক বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন

খ. আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানের করণীয়

১. শিল্পকলা একাডেমী, শিশু একাডেমী, বাংলা একাডেমী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আদিবাসীদের জন্য পৃথক শাখা স্থাপন

২. বিলুপ্তপ্রায় অসংখ্য লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণসহ বিবিধ সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ

গ. বেসরকারি সংস্থার করণীয়

১. আদিবাসীদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ ধারণ করে এমন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা

২. আদিবাসীদের সমস্যাগুলোকে জাতীয় পর্যায়ে উপস্থাপন

৩. সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করার প্রয়াস চালানো

ঘ. আদিবাসীদের করণীয়

১ গণসচেতনতার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে স্থানীয় আদিবাসীদের কার্যকর ভূমিকা

২. যেসব সমস্যার ক্ষেত্রে একক পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে সমমনা সংস্থার সঙ্গে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণ

৩. স্ব-স্ব ইতিহাস ঐতিহ্যবিষয়ক গবেষণাকর্ম প্রকাশ ও প্রচার

৪. ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে আধুনিকীকরণ বা যুগোপযোগী করে প্রচার। একই সঙ্গে এর ঐতিহ্যের প্রতি গুরুত্বারোপ

৫. পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের আদিবাসী সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলে অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ আন্দোলনে একে অপরকে সহায়তা দান

৬. স্থানীয় সচেতন মহলকে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রতি আগ্রহী করে তোলা। মেধাবী অথচ নিষ্ক্রিয় কর্মীদের খুঁজে বের করে সক্রিয়করণ। গ্রামে অসংগঠিতভাবে যারা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন তাদের সংগঠিত করা

৭. মন্দির/ক্যাংভিত্তিক যে শিক্ষাব্যবস্থা মারমা সমাজে চালু আছে, সেই অনুসারে মাতৃভাষার কার্যক্রম পরিচালনা

৮. মৌখিক লোকসাহিত্য সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ এবং 'উসাই'-এর মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা

৯. মূলধারা থেকে পিছিয়ে থাকা জাতিসত্তার সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ সংরক্ষণে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি।

সাত

বিগতদিনে নিজেদের ভাষার অধিকার, স্বাধিকার, ছোটর অধিকার ইত্যাদি নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, আমাদের একই ভূখন্ডের অপরাপর জাতিসত্তার কৃষ্টি, ঐতিহ্য, দুঃখ, বেদনার কথা মনেই করিনি। আমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম সেইসব নারী-পুরুষের কথা। আমরা আমাদের সংগ্রামে, আমাদের দুঃখ-বেদনার সঙ্গী করতে পারিনি এদের। আমরাও হতে পারিনি ওদের উচ্চারিত, অনুচ্চারিত দুঃখ-বেদনায় সমব্যথী।

পাহাড়ী জনপদে উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসেবে সাত লক্ষাধিক জুম্মজনগোষ্ঠীর বেদনাহত জীবনের দিকে প্রথমেই তাকাতে হবে। তাদের সকল দুঃখের প্রদীপ অন্তর দিয়ে অনুভব করতে হবে। হতে হবে তাদের আনন্দ বেদনার বিশ্বস্ত সঙ্গী। তবেই সবুজ অরণ্যে বারুদের গন্ধ দূর হয়ে নির্মল বাতাস প্রবাহিত হবে। হারিয়ে যাওয়া জীবন, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা সবই ফিরে আসবে। তবেই সত্য যুগের চম্পক নগরের মতো আজকের কলিযুগে পার্বত্য জনপদের ঘরে ঘরে সুখ, আনন্দের বন্যা নেমে আসবে (গেংখুলীদের একটি পালা গানের ক'টি লাইন– 'চম্পক নগরের গ্রামে পালা গায়, তখন সত্য যুগ। ঘরে ঘরে সুখ ছিল।' চম্পক নগর হয়তোবা চাকমাদের কোনো গ্রাম দেশকেই কল্পনা করে বলা হয়েছে গানে, যেখানে সত্য ছিল। জীবনে সুখ ছিল। –সঞ্জীব দ্রং)। তবেই একদিন পাহাড়ী জনপদে স্বপ্নের ভোর হবে। তবেই আদিবাসী কলামিস্ট সঞ্জীব দ্রং-এর প্রত্যাশানুযায়ী গানে গানে বেহালার সুরে সুরে গেংখুলীরা পাহাড়ী জীবনের অতীত ও সুন্দর ভবিষ্যতের কথা বলবে। গারো পাহাড়ের সেরেংজিংয়ের সঙ্গে গেংখুলীর ভালোবাসা সূচিত হবে। কোচপানা ও নামনিকা এক হবে। সঞ্জীব দ্রং-এর মতো আমিও আজ এরকমই স্বপ্ন দেখি। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের কাছে আমারও অন্তরতম আকুতি, আমাকে এরকম একটি স্বপ্ন দেখতে সহায়তা করুন। ঝিমিত ঝিমিত চাকমা, মানস মুকুর চাকমা, মৃত্তিকা চাকমা, সঞ্জীব দ্রং, শিশির চাকমা, শান্তিময় চাকমার সঙ্গে পূর্ণিমার রাতে সেই মাচাং ঘরে আমি, আমরা আবার, একবার নয়, বারবার, রাতের পর রাত, দিনের পর দিন কথা বলতে চাই। ছাদ ফাটিয়ে, রাতের নির্জনতা ছিন্নভিন্ন করে হাসতে চাই। কারণ আমি এখানে বারবার এসে অনুভব করেছি, এতদিনে তাদের জীবন থেকে জীবন হারিয়ে গিয়েছে। স্বপ্নহীন হয়ে পড়েছে এই সুঠাম কান্তি মানুষগুলো। তাই আজকের মুক্ত পরিবেশে আমিও প্রত্যাশা করি, পার্বত্য জনপদের সরল, উদারনৈতিক এই মানুষগুলো এবার নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখুক। কিন্তু এজন্য সবার আগে সাত লক্ষাধিক জুম্মজনগোষ্ঠীর আনন্দ, বেদনার বিশ্বস্ত সঙ্গী হতে হবে।

কুমার প্রীতীশ বল
সমন্বয়ক, উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ
জনশিখন কর্মসূচি, এফআইভিডিবি

মো. ইয়াসিন আরাফাত

আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলার ব্যবহার শিখন জটিলতা ও উত্তরণ

ভূমিকা

রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সূত্র ধরে বাংলাদেশে বসবাসকারী সকল জনগোষ্ঠী বাংলাদেশি নামে পরিচিত হলেও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্নতা। বৃহত্তর বাঙালি জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি বহু শতাব্দী ধরে এদেশে বসবাস করে আসছে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, মতান্তরে যারা আদিবাসী নামে পরিচিত। তাদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সমাজ-কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস ও উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রেখে চলেছে বহুকাল ধরে। এই স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এই ভূখণ্ডে নিতান্ত কম নয়। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ১৫ লক্ষ আদিবাসীর বসবাস, যা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২ ভাগ।

প্রতিটি দেশের নাগরিক রাষ্ট্রের প্রতি যেমন কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হয়, তেমনি সে কিছু অধিকারও ভোগ করে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আদিবাসীদের অধিকার প্রাপ্তির চিত্র বেশ হতাশাজনক। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত বিশেষত্বের কারণে আদিবাসী জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে বৈষম্যের শিকার হয়ে আসছে। গুণগত ও সম-সুবিধাসম্পন্ন শিক্ষাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আরো প্রকট। তুলনামূলক বিচারে, আদিবাসীদের শিক্ষার বর্তমান অবস্থা কোনভাবেই সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশ সরকারের ২০১৩ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষায় সামগ্রিক ভর্তির হার ৯৮.৭ শতাংশ। কিন্তু শুধু আদিবাসী শিক্ষার্থী বিবেচনা করলে এই হার ৭০ শতাংশেরও কম। পার্বত্য চট্টগ্রামে ৬-১০ বছর বয়সী মাত্র ৫৬.৮ শতাংশ শিশু প্রাথমিকে ভর্তি হয়, যাদের আবার শতকরা ৬০ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষাস্তর শেষ করার পূর্বেই ঝরে পড়ে।

আদিবাসী শিশুদের শিক্ষা সম্পর্কিত বেশির ভাগ গবেষণাই প্রাথমিক স্তরে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষা ব্যবহৃত না হওয়াকে তাদের শিক্ষার বিদ্যমান শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 'মাতৃভাষা' বলতে আমরা সাধারণত সে ভাষাকেই বুঝি, যা শিশু জীবনের প্রথমেই শেখে এবং সবচেয়ে ভাল বলতে ও অনুধাবন করতে পারে। শিক্ষাবিজ্ঞানী ওয়াল্টার এর মতে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিশু 'যে ভাষা প্রথমেই শেখে' এবং 'যে ভাষা সে সবচেয়ে ভাল বলে' তা অভিন্ন হয়ে থাকে। গত তিন দশক ধরে শিক্ষায় ন্যূনতম প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত শিশুর মাতৃভাষা ব্যবহারের ওপর জোরারোপ করা হচ্ছে। ইয়ামু ও অগেইগবিন-এর মতে, মাতৃভাষায় অর্জিত শিখন অভিজ্ঞতা শিশুর জ্ঞানীয় সক্ষমতার বিকাশ ঘটায়। তাছাড়া, শিশুর শিখন পরিবেশ যদি তার মাতৃভাষামণ্ডিত হয়, তাহলে সে শ্রেণীকক্ষের বাইরেও অনেক কিছু অতি দ্রুত শিখতে পারে। আবিরি এর মতে, শিশুর মনো-সামাজিক উন্নয়নে মাতৃভাষা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানী কামিন্স বলেন, মাতৃভাষায় শিশুর

সক্ষমতা দ্বিতীয় ভাষা শেখার অন্যতম পূর্বশর্ত। বিশ্বব্যাংক (২০০৫) শিক্ষায় শিশুর মাতৃভাষায় ব্যবহারের ৫টি ইতিবাচক দিক চিহ্নিত করেছে, যথা, ক) শিক্ষা গ্রহণের হার বৃদ্ধি ও সক্ষমতা আনয়ন; খ) শিখনফল অর্জনের মাত্রা বৃদ্ধি; গ) পুনরাবর্তন ও ঝরে পড়ার হার হ্রাস; ঘ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক সুফল আনায়ন; ঙ) শিক্ষার সামগ্রিক ব্যয় হ্রাস।

শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিশু যদি তার মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে না পারে, তাহলে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিশুর নিজস্ব পরিমণ্ডল তথা সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিশাল ব্যবধান সূচিত হয়। এই ব্যবধান পরবর্তী কালে শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী শিশুদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ নিতান্তই সামান্য। AITPN (Asian Indigenous and Tribal Peoples Network, ২০০৭) এর মতে, বাংলাদেশে আদিবাসী শিশুরা এমন একটি ভাষায় শিক্ষা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে, যে ভাষায় তাদের জ্ঞান বা বোধগম্যতা নেই বা খুবই কম। আর এর ফলে হিসেবে প্রাথমিক স্তর শেষ করার পূর্বেই ঝরে পড়ছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আদিবাসী শিশু। বাংলাদেশ সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এটি বড় একটি অন্তরায়ও বটে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার অবস্থা নিয়ে পরিচালিত বেশির ভাগ গবেষণাই প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা ব্যবহার না হওয়াকে তাদের শিক্ষার মান অর্জনে অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে তুলে ধরেছে। কিন্তু মাতৃভাষা ব্যবহার না হওয়ার ফলে প্রকৃতপক্ষে কী ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, সে সম্পর্কিত গবেষণা বাংলাদেশে মোটামুটি অপ্রতুল বলা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন আপোস চলে না। আর সে কারণেই গবেষণালব্ধ উপায়ে শিক্ষার বিভিন্ন দিক তুলে আনা বাঞ্ছনীয়। এই গবেষণায় মূলত শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া ও শিখন উপকরণে মাতৃভাষা ব্যবহার না করার ফলে প্রাথমিক স্তরের আদিবাসী শিশুরা কী ধরনের শিখন জটিলতার সম্মুখীন হয় তা প্রাধান্য পেয়েছে।

১৯৯৭ সালে প্রণীত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি থেকে শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (PEDP), দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP)-সহ বিভিন্ন চুক্তি ও নীতিতে আদিবাসীদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব প্রদান করেছে বাংলাদেশ সরকার। তাছাড়া, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-তেও আদিবাসীদেরকে তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, এসব চুক্তি বা নীতি কাগজেই সীমাবদ্ধ রয়েছে, এখনো বাস্তবায়িত হয়নি এর কোনটাই। এই গবেষণার ফলাফলের মাধ্যমে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার এমন একটি দিকের চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে, যা আদিবাসীদের শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে উপলব্ধি করতে সহায়তা করবে। অন্যদিকে, আদিবাসীদের জন্য শিক্ষাক্রম প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই গবেষণার ফলাফল একটি দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম। তাছাড়া, এই গবেষণায় এমন কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের চিত্র ফুটে উঠেছে, যে সকল বিদ্যালয়ে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে। আদিবাসীদের শিক্ষা সম্পর্কিত যে কোন কার্যক্রমে এই তথ্য কাজে লাগানো যেতে পারে।

গবেষণা প্রশ্ন

এই গবেষণার মাধ্যমে মূলত ৩টি প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা করা হয়েছে।

১. শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আদিবাসী শিশুরা কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়?

২. বাঙালি সহপাঠীদের সাথে আলোচনা বা মিথস্ক্রিয়ার ক্ষেত্রে আদিবাসী শিশুরা কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়?

৩. বাংলা ভাষায় লিখিত শিখন উপকরণ অধ্যয়ন ও অর্থ উপলব্ধির ক্ষেত্রে আদিবাসী শিশুদের সমস্যাগুলো কী কী?

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটি মূলত মিশ্র পদ্ধতির, তবে এতে গুণগত অংশের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলাকে নির্বাচন করা হয়েছে, কেননা বাংলাদেশে বসবাসকারী আদিবাসী জনগোষ্ঠীর এক বিশাল অংশ এই অঞ্চলে বসবাস করে। নমুনা হিসেবে মোট ১২টি (প্রতিটি জেলা থেকে ৪টি করে) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্দেশ্যমূলক পদ্ধতিতে বেছে নেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, এমন বিদ্যালয় নির্বাচন করা হয়েছে, যেখানে ন্যূনতম শতকরা ৪০ জন আদিবাসী শিক্ষার্থী রয়েছে। নির্বাচিত বিদ্যালয়ের প্রতিটি থেকে ১ জন করে মোট ১২ জন শিক্ষক, ২ জন করে মোট ২৪ জন (প্রতিটি জেলা থেকে ৮ জন করে) আদিবাসী শিক্ষার্থী দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে মোট ১২টি শ্রেণীকক্ষ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রতিটি শিক্ষকের আলাদাভাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে এবং প্রতিটি জেলার নির্বাচিত ৮ জন আদিবাসী শিক্ষার্থীর সাথে ১টি করে ৩ জেলায় ৩টি ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত গুণগত তথ্যসমূহের বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং পরিমাণগত তথ্যের ক্ষেত্রে শ্রেণী বন্টন ও শতকরা হার বের করে তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত ভাষা

যেহেতু বাংলাদেশে এখনো মাতৃভাষা ভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা চালু হয় নি, তাই এটা প্রত্যাশিত যে, নির্বাচিত বিদ্যালয়সমূহে বাংলাই ব্যবহার করা হবে। তারপরও এই গবেষণার মাধ্যমে নির্দেশনার ভাষা হিসেবে কোন ভাষা ব্যবহার করা হয়, তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। নির্দেশনার ভাষা হিসেবে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তার হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের সময় শিক্ষকের ব্যবহৃত শব্দগুলোর একটি আনুমানিক হিসাব করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, আনুমানিক ৯৬ শতাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা ব্যবহার করা হয়েছে। শিক্ষকরা অল্প কিছু আদিবাসী শব্দ ব্যবহার করেছেন, আনুমানিক হিসেবে যার হার শতকরা মাত্র ৩ ভাগ। বাকি ১ শতাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক ইংরেজি ব্যবহার করেছেন।

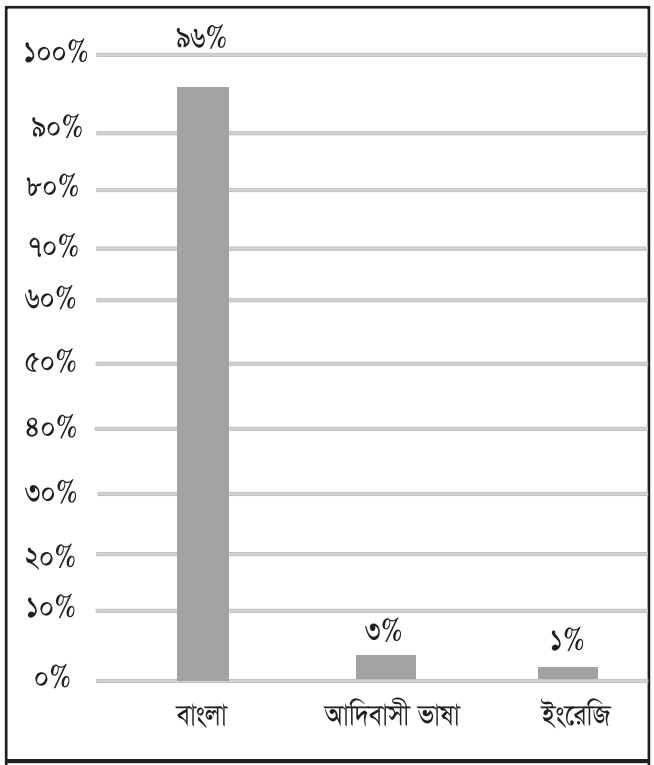

চিত্র ১- পাঠ কার্যক্রমে ব্যবহৃত ভাষা

অন্যদিকে, সাক্ষাৎকারের তথ্য থেকেও দেখা যায়, সব শিক্ষকই স্বীকার করেছেন যে, তারা শ্রেণীকক্ষে সাধারণত বাংলা ছাড়া অন্য কোন ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করেন না। কেবল ইংরেজি বিষয়ের পাঠ কার্যক্রমে কিছু ইংরেজি ব্যবহার করেন। বেশির ভাগ শিক্ষকের মতে, একই শ্রেণীকক্ষে বাঙালি ছাড়াও বিভিন্ন ভাষাভাষী আদিবাসী শিক্ষার্থী থাকে। যেহেতু আদিবাসী শিক্ষার্থীরা কমবেশি বাংলা জানে, তাই বাংলা ব্যবহার করাটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন তারা।

শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

আদিবাসী শিক্ষার্থীরা শ্রেণী কার্যক্রমে কতটুকু মাত্রায় অংশগ্রহণ করে তা পরিমাপ করার জন্য দুইটি নির্ধারক ব্যবহার করা হয়েছে, যথা: 'শিক্ষককে প্রশ্ন করা' এবং 'শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দেয়া'। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎসের তথ্যের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। বেশির ভাগ শিক্ষকই মনে করেন, ভাষাগত ভিন্নতার কারণে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে খুব একটা সমস্যা হয় না। কিন্তু পাঠ পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, খুব কম আদিবাসী শিক্ষার্থীই শ্রেণী কার্যক্রমে সক্রিয় ছিল। মাত্র ৭% আদিবাসী শিক্ষার্থীকে পাওয়া গেছে, যারা মোটামুটি সবসময় শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে। অন্যদিকে, ১৪% শিক্ষার্থীকে মাঝে মাঝে প্রশ্নের উত্তর দেয়া এবং ৭% শিক্ষার্থীকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে দেখা গেছে। তাছাড়া, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ৫৭% এবং উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে ৫০% আদিবাসী শিক্ষার্থীকে পাওয়া গেছে যারা কদাচিৎ সক্রিয় ছিল। আবার উভয় ক্ষেত্রেই একেবারেই নিষ্ক্রিয় ছিল এমন আদিবাসী শিক্ষার্থীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

অংশগ্রহণের মাত্রা	নির্ধারক	
	প্রশ্ন করা	উত্তর প্রদান
সবসময়	০%	৭%
প্রায় সময়	৭%	৭%
মাঝে মাঝে	৭%	১৪%
কদাচিৎ	৫৭%	৫০%
কখনোই না	২৯%	২২%

টেবিল ১- আদিবাসী শিক্ষার্থীদের শ্রেণী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাত্রা

শিক্ষকদের একাংশের মতে, বেশির ভাগ শ্রেণীকক্ষে বাঙালি শিক্ষার্থী তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় মনে হতে পারে, বাঙালি শিক্ষার্থীরা বেশি সক্রিয়, কিন্তু উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আদিবাসী শিক্ষার্থীও শ্রেণী কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। আবার শিক্ষকদের অন্য অংশ মনে করেন, বাংলায় কথা বলতে অনেক শিক্ষার্থীই যথেষ্ট অস্বস্তি অনুভব করে। তাই কোন উত্তর দেয়া বা প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে যদি কঠিন কোন শব্দের ব্যবহার করতে হয়, সেক্ষেত্রে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে চায় না। এফজিডি-তে আলোচনার সময়ও এই বাস্তবতা লক্ষ করা গেছে। একটু বড় বা যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দগুলো আদিবাসী শিক্ষার্থীরা বলতে পারছিল না। একজন আদিবাসী শিক্ষার্থী

বলেছে, "আমি মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু অনেক সময় শিক্ষক আমার কথা বুঝতে পারেন না। "বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই স্বীকার করেছে যে, তারা বাংলায় খুব একটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, তাই প্রশ্ন করা বা উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ কম থাকে।

পাঠ অনুধাবন

পাঠ পরিচালনায় বাংলা ব্যবহার করার ফলে পাঠ সম্পর্কিত আলোচনা বোঝার ক্ষেত্রে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। সকল শিক্ষকই এই মর্মে মতামত দিয়েছেন যে, আদিবাসী শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখোমুখি হয় প্রথম শ্রেণীতে। পরবর্তী কালে বাঙালি সহপাঠীদের সংস্পর্শে থাকতে থাকতে সমস্যা কমতে থাকে। তথাপি একটু লম্বা বাক্য, যুক্তবর্ণ সম্বলিত শব্দ কিংবা জটিল শব্দ বুঝতে তাদের সমস্যা হয় বলে শিক্ষকেরা মন্তব্য করেছেন। বেশির ভাগ শিক্ষকই মনে করেন, প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়নরত শতকরা প্রায় ৫০ জন আদিবাসী শিক্ষার্থীই বাংলায় নির্দেশনা বুঝতে কমবেশি সমস্যার মুখোমুখি হয়।

অন্যদিকে, শিক্ষার্থীদের মতে, কখনো কখনো শিক্ষক অনেক দ্রুত কথা বলেন, তখন তার কথা বুঝতে বেশি সমস্যা হয়। শিক্ষক দ্রুত কথা বলার কারণে বুঝতে না পারলে শিক্ষককে ধীরে কথা বলার অনুরোধ করে কিনা জানতে চাওয়া হলে তারা 'না' বোধক উত্তর দিয়েছে। তাছাড়া এফজিডি-তে আলোচনা করার সময়ও তাদেরকে অনেক প্রশ্নই অত্যন্ত সহজ ও ছোট শব্দ ব্যবহার করে বেশ কয়েকবার বুঝিয়ে বলতে হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের ভাষা উপলব্ধি

আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বেশ বড় একটা অংশেরই পাঠ্যপুস্তকের ভাষা উপলব্ধি করতে বেশ কসরত করতে হয়। শিক্ষকদের মতে, কিছু কিছু বাংলা শব্দের দুইয়ের বেশি প্রতিশব্দ রয়েছে, পরিচিত শব্দের বাইরে যদি কোন প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা তা বুঝতে পারে না। আবার কিছু কিছু বাংলা শব্দের বানানের ধরন কিছুটা জটিল, এই ধরনের শব্দ পড়তে বা বুঝতে তাদের সমস্যা হয়। অন্যদিকে, শিক্ষকদের একাংশ মনে করেন, আদিবাসী শিক্ষার্থীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা যতটা না ভাষার কারণে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিষয়বস্তুর কাঠিন্যের কারণে।

তবে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই জানিয়েছে যে, বাংলায় লিখিত পাঠ্যপুস্তক পড়তে তাদের বেশ সমস্যা হয়। কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতে, বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা নেই, সে জন্য তারা বিরাম-চিহ্ন শুদ্ধভাবে পড়তে পারে না। ফলে হিসেবে মাঝে মাঝে বাক্যের অর্থের পরিবর্তন ঘটে। পাঠ্যপুস্তকের ভাষা কঠিন হওয়ায় সমস্যা সমাধানে খুব কম শিক্ষার্থীই শিক্ষকের দ্বারস্থ হয়। তারা কোন শব্দ বা বাক্য না বুঝলেও তা মুখস্ত করে ফেলে।

শ্রেণীকক্ষে আসন নির্বাচনে বিবেচ্য

শ্রেণীকক্ষে আসন নির্বাচনের ক্ষেত্রে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়নি। পর্যবেক্ষিত প্রায় সকল শ্রেণীকক্ষেই আদিবাসী শিক্ষার্থীরা বাঙালি ও অন্য আদিবাসী সহপাঠী উভয়ের সাথেই বসেছে। শিক্ষকদের মতে, আদিবাসী শিক্ষার্থীরা তাদের বাঙালি সহপাঠীদের সাথে বসতে কোন অস্বস্তি অনুভব করে না। শিক্ষকেরা এও জানিয়েছেন যে, কিছু কিছু আদিবাসী শিক্ষার্থীর মধ্যে তাদের নিজস্ব সম্প্রদায়ের সহপাঠীর সাথে বসার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তবে এ সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়।

বাঙালি সহপাঠীদের সাথে মিথস্ক্রিয়া

শ্রেণীকক্ষে বসার ক্ষেত্রে বাঙালি সহপাঠীদের সাথে বসলেও, তাদের সাথে কোন বিষয় নিয়ে খুব একটা আলোচনা হয় না বলে মনে করেন শিক্ষকরা। অনেক আদিবাসী শিক্ষার্থীই বাংলা বলতে পারে, কিন্তু তাদের উচ্চারণে আঞ্চলিকতার টান থাকে প্রকট। এ কারণে বাঙালি সহপাঠীদের অনেকেই তাদের ভাষা বুঝতে পারে না। শ্রেণীকক্ষে দলীয় কাজ দেয়া হলে, তাতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ অনেক কম থাকে। বিশেষ করে, একই দলে বাঙালি ও আদিবাসী থাকলে, বাঙালি শিক্ষার্থীরাই আলোচনায় বেশি অংশগ্রহণ করে।

অন্যদিকে, এফজিডি-তে আলোচনাকালে বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই জানিয়েছে যে, তাদের খুব বেশি বাঙালি বন্ধু নেই এবং তাদের সাথে কথাও হয় খুব কম। এর কারণ হিসেবে বাংলা ভাল না জানাকেই দায়ী করেছে তারা।

শিক্ষায় আদিবাসী শিশুদের প্রত্যাশিত ভাষা

আদিবাসী শিক্ষার্থীরা শিক্ষায় নিজেদের মাতৃভাষা ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে। তারা মূলত নিজেদের ভাষায় পাঠ পরিচালনা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কথা বলেছে। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায়, দুই-তৃতীয়াংশের বেশি শিক্ষার্থী চায়, শিক্ষায় তাদের নিজেদের মাতৃভাষা ব্যবহার করা হোক। অন্যদিকে, ২১% শিক্ষার্থী মনে করে, নিজেদের মাতৃভাষা ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভাল হয়, কিন্তু বাংলা ব্যবহার করলেও তাদের কোন সমস্যা নেই। মাত্র ৮% শিক্ষার্থী বাংলা ব্যবহার করার কথা বলেছে। শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হলে বাংলা পছন্দ করার সুনির্দিষ্ট কোন কারণ তারা বলতে পারে নি। তবে সাক্ষাৎকারে শিক্ষকেরা বলেছেন, শিক্ষাজীবনের পরবর্তী পর্যায়ে

গিয়ে যেহেতু আবার বাংলায়ই পড়তে হবে, তাই অনেকেই চায় প্রাথমিক থেকেই তাদেরকে বাংলায় পড়ানো হোক।

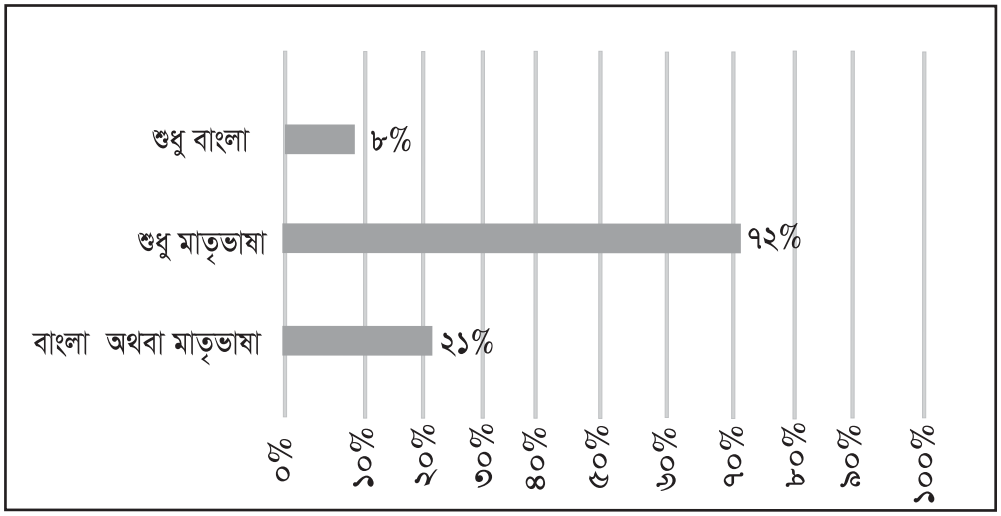

চিত্র ২ - শিক্ষায় আদিবাসী শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত ভাষা

মাতৃভাষা ব্যবহারের সুবিধা ও সমস্যা

আদিবাসীদের শিক্ষায় মাতৃভাষা ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বহুদিন ধরে। শিক্ষক ও আদিবাসী শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই মাতৃভাষা ব্যবহারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাদের মতামতের ভিত্তিতে নিচের তালিকাটি তৈরি করা হয়েছে।

সুবিধা

- শিক্ষার্থীদের শিখন কার্যকর ও টেকসই হবে।
- পাঠ কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
- বিষয়বস্তু সহজে আত্মস্থ করতে পারবে, যা তাদের মুখস্ত করার প্রবণতা হ্রাস করবে।
- সব ক্ষেত্রে বাংলা ব্যবহারের কারণে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি হীনমন্যতা কাজ করে। শিক্ষায় তাদের মাতৃভাষা ব্যবহার করা হলে তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।
- আদিবাসী শিশুদের সামাজিকীকরণ সহজ ও সাবলীল হবে।
- বিদ্যালয়ে আদিবাসী শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বৃদ্ধি পাবে।
- আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমে যাবে।

সমস্যা

- প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করলেও পরবর্তী কালেও বাংলায় পড়তে হবে এবং তখন ইংরেজিও শিখতে হবে, যা তাদের জন্য বড় একটা চ্যালেঞ্জ হবে।
- বাংলাদেশে ৫০টিরও বেশি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে। প্রতিটি সম্প্রদায়ের ভাষা ভিন্ন। আবার অনেক সম্প্রদায়ের লিখিত হরফও নেই। এমতাবস্থায়, মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু করতে হলে সব ভাষার জন্য পৃথক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে, যা অবশ্যই প্রায় দুঃসাধ্য এক প্রকল্প।
- মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু করতে হলে প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে ঐ ভাষার শিক্ষক নিতে হবে। কিন্তু আদিবাসীদের অনেক সম্প্রদায়েই শিক্ষক হওয়ার মত যোগ্য বা শিক্ষিত লোক নেই।
- নিজেদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করলে আদিবাসী শিক্ষার্থীরা পরবর্তী কালে বাঙালিদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারবে না।

সামগ্রিক পর্যালোচনা

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা প্রবল। এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, কেবল ভাষাগত জটিলতার কারণে আদিবাসী শিশুরা শিক্ষাক্ষেত্রে নানা রকম সমস্যার মুখোমুখি হয়। যার ফলে, একদিকে যেমন তারা মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে অন্যান্য অধিকার আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতাও তাদের তৈরি হচ্ছে না। এই গবেষণায় মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার কিছু নেতিবাচক দিকও উঠে এসেছে। তথাপি, বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায়, মাতৃভাষায় শিশুর শিক্ষা আনন্দদায়ক হয়, শৈশবেই জ্ঞানের একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি হয় এবং প্রত্যাশিত শিখনফল সহজে অর্জিত হয়। পাশাপাশি, শিক্ষায় প্রবেশ বৃদ্ধি ও ঝরে পড়ার হার রোধ করার ক্ষেত্রে শিশুর মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বাঙালিদের তুলনায় অনেক কম। এর পেছনে ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তবে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের মতে ভাষাই একমাত্র কারণ নয়। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ই রক্ষণশীল জীবন-যাপন করতে পছন্দ করে। তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। তাদের বিশ্বাস, শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের সন্তানেরা নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যাবে। তাই

বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর পরিবর্তে তারা তাদের সন্তানদেরকে পারিবারিক পেশায় নিয়োজিত করতেই বেশি আগ্রহী থাকেন।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকার ৬টি আদিবাসী ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। যদিও তা প্রাক-প্রাথমিক স্তরের জন্য, তথাপি নিঃসন্দেহে এটি একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। এই উদ্যোগ কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের পাশাপাশি ন্যূনতম প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের পদক্ষেপ নিতে হবে। তদুপরি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার সুফল সম্পর্কে নির্বাচিত অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের জন্য সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নিতে হবে, যাতে করে শিক্ষা গ্রহণের প্রভাব সম্পর্কে তাদের গোঁড়ামি কেটে যায়। বাংলাদেশে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তে অনেকদিন ধরে বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। তাদের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে সরকারিভাবে বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ইতোমধ্যে এ ব্যাপারে তাদের সদিচ্ছা প্রদর্শন করেছে। এখনই সময় তার বাস্তব প্রতিফলন ঘটানোর।

বাংলাদেশে আদিবাসী শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার বাঙালিদের তুলনায় অনেক কম। এর পেছনে ভাষার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তবে সাক্ষাৎকারে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকদের মতে ভাষাই একমাত্র কারণ নয়। অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ই রক্ষণশীল জীবন-যাপন করতে পছন্দ করে। তারা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। তাদের বিশ্বাস, শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের সন্তানেরা নিজস্ব সংস্কৃতি ভুলে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে একাত্ম হয়ে যাবে। তাই বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর পরিবর্তে তারা তাদের সন্তানদেরকে পারিবারিক পেশায় নিয়োজিত করতেই বেশি আগ্রহী থাকেন।

সুপারিশ

সুপারিশ হিসেবে এটা বলার প্রয়োজন নেই যে, আদিবাসীদের জন্য অন্তত প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা চালু করা দরকার। কেননা এই প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যকীয় এবং বহুল আলোচিত। তবে এই গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে এবং শিক্ষাব্যবস্থার বর্তমান অবস্থার আলোকে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা যেতে পারে।

- পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষাক্রম উপকরণ প্রণয়নে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা বোধগম্যতার মাত্রা বিবেচনায় আনা উচিত।
- পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মাধ্যমে আদিবাসী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ইতিবাচকভাবে তুলে আনা উচিত।
- ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা কিছুটা লাঘব করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি আকর্ষণীয় শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করা প্রয়োজন।
- আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যেখানে আদিবাসী সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণার পাশাপাশি আদিবাসী শিক্ষার্থীদের পাঠ পরিচালনার বিশেষ দিকগুলো প্রাধান্য পাবে।
- বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সহ-শিক্ষামূলক কার্যক্রমে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার জন্য তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করতে হবে, এতে করে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

উপসংহার

বহু বছর ধরে এই ভূ-খণ্ডে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে বহু ক্ষেত্রে। শিক্ষা তার মধ্যে অন্যতম। একটি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় সম্ভবত শিক্ষাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। গুণগত শিক্ষা যে কোন সমাজের দৃশ্যপট পরিবর্তন করতে সক্ষম। আর একটি দেশের জনগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য একটি অংশকে বাদ দিয়ে এই পরিবর্তন সম্ভব নয়। অন্যদিকে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সকলকে শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। আর সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং উন্নয়নে অংশীদার করার জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু করে আদিবাসীদের শিক্ষার পথটা সুগম ও প্রশস্ত করা একান্ত অপরিহার্য। এর ফলে, একদিকে তারা যেমন নিজেদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য উপযোগী দক্ষতা ও সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে, অন্যদিকে তেমনি বাংলাদেশও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ একটি দেশে পরিণত হবে।

মো. ইয়াসিন আরাফাত
অফিসার, আইসিটি ইন এডুকেশন, READ,
সেভ দ্য চিলড্রেন, বাংলাদেশ

৫৮টি প্রাইমারি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই

কচুয়া উপজেলায় ৫৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন থেকে শূন্য রয়েছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে লেখাপড়া। কোন কোন বিদ্যালয়ে দু'একজন শিক্ষক দিয়ে চলছে পাঠদান কার্যক্রম। ৫৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩১টি রয়েছে নব জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়। প্রধান শিক্ষকবিহীন পূর্বের জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে– রাগদৈল, শুয়ারুল, বারৈয়ারা, আটমোড়, বড়দৈল, বড়দৈল, বাইছারা, তেগুরিয়া, হরিপুর, বুধুন্ড, উত্তর শিবপুর, কহলথুড়ী, বুরগী, লক্ষ্মীপুর, আশ্রাফপুর, বড় তুলাগাও, মেঘদাইর, বক্সগঞ্জ, খিলমেহের, বরুচর, উত্তর উজানী, করইশ, পশ্চিম মধুপুর, আয়মা, গুলবাহার, দারাশাহী, তুলপাই, কোয়া কোট মডেল।

নব জাতীয়করণকৃত প্রধান শিক্ষকবিহীন সরকারি বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে রয়েছে বেরকোটা, দুর্গাপুর, চাংপুর, নিন্দপুর, পূর্ব প্রসন্নকাপ, পশ্চিম তুলপাই, কড়ইয়া উত্তর, নাছিরপুর, দক্ষিণ আকানিয়া, নলুয়া, দক্ষিণ আশ্রাফপুর, জুনাশর, খিড্ডা, তেতৈয়া, খিলা, সানন্দকরা, পশ্চিম আলীয়ারা, নলুয়া-দৌলতপুর, দড়িয়া হায়াতপুর, নলুয়া-দৌলতপুর শিশুসদন, জুগিচাপর, পশ্চিম মাঝিগাছা, বদরপুর, কান্দিরপাড়, আকিয়ারা, কেশরকোট, শাহারপাড়, ধনাইয়া আশ্রাফপুর, এনায়েতপুর, মালচোয়া ও ভবানীপুর।

এ ব্যাপারে কচুয়া উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করা তিনি জানান, প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে প্রায় ৩ মাস পূর্বে সিনিয়র সহকারী ও শিক্ষকদের গ্রেডেশন তালিকা অনুমোদনের জন্য জেলা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। প্রেরিত তালিকার অনুমোদন এখনও পাওয়া যায়নি।

ইত্তেফাক ৬.০৮.২০১৪

পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করুন

মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অবগত করতে সংশ্লিষ্ট সকল পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষার সিলেবাসে বাধ্যতামূলকভাবে 'বাংলাদেশের ইতিহাস' অন্তর্ভুক্ত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মকমিশনসহ (পিএসসি) চারটি সংস্থাকে চিঠি দিয়েছে আইন কমিশন। চিঠিতে ইংরেজি মাধ্যমসহ সকল স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষাসহ সমপর্যায়ের পাঠ্যসূচি এবং সরকারি কর্মকমিশন, জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন ও বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (জেটি) পরীক্ষার সিলেবাসে বাধ্যতামূলকভাবে 'বাংলাদেশের ইতিহাস' অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। গত ১৪ জুলাই জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন, ১৬ জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ৫ আগস্ট জেটি ও ৬ আগস্ট সরকারি কর্মকমিশনকে চিঠি দেওয়া হয়।

২০০৭ সালের ৩ মে হাইকোর্টের এক রায়ে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী বা সমপর্যায়ভুক্ত সকল শ্রেণীর পাঠ্যসূচিতে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের বিষয়ে সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে বলা হয়। জানা যায়, ওই রায়ের আলোকে মাধ্যমিক পর্যন্ত কিছু ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে তা খুবই সীমিত। এই প্রেক্ষাপটে আইন কমিশন থেকে এবার সর্বস্তরে বাধ্যতামূলকভাবে মুক্তিযুদ্ধের তথা 'বাংলাদেশের ইতিহাস' পাঠ্যসূচি ও পরীক্ষার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করতে চিঠি দেওয়া হলো। আইন কমিশনের চেয়ারম্যান সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক *সমকাল*-কে বলেন, দেশের সঠিক ইতিহাস জানা প্রতিটি বাঙালির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের ইতিহাস জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। এ কারণেই সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সরকারি কর্মকমিশনকে দেওয়া চিঠিতে বলা হয়, এ কমিশন প্রজাতন্ত্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের জন্য যাচাই ও পরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। নিয়োগপ্রাপ্তরা দেশে ও বিদেশে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাই কর্মকর্তাদের মুক্তিযুদ্ধ ও ত্রিশ লাখ শহীদের আত্মত্যাগ, দুই লাখ মা-বোনের সর্বোচ্চ ত্যাগ এবং কোটি বাঙালির ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে কর্মকমিশনের পরীক্ষার পাঠ্যসূচিতে 'বাংলাদেশের ইতিহাস' বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চিঠিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান ইকরাম আহমেদ গতকাল সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে *সমকাল*-কে বলেন, 'এটা খুবই ভালো উদ্যোগ। প্রশংসার দাবি রাখে। এ বিষয়ে কারও দ্বিমত থাকার কথা নয়। চিঠি পাওয়ার পর অনানুষ্ঠানিকভাবে তা কার্যকরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে কমিশনের বৈঠকে চিঠি উপস্থাপনের পর যে সিদ্ধান্ত আসবে, তার আলোকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন ও জেটিকে দেওয়া পৃথক চিঠিতে বলা হয়, বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাসহ দেশের সকল নাগরিকেরই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস জানা কর্তব্য। চিঠিতে কমিশনের অধীন বিজেএস পরীক্ষার সিলেবাস ও পরীক্ষা সূচিতে এবং জেটির অধীন বিচারকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় 'বাংলাদেশের ইতিহাস' বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, আইন কমিশনের চিঠি অনুসারে ইতিমধ্যে দুটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পরীক্ষা সূচি ও প্রশিক্ষণ কর্মশালার সিলেবাসে 'বাংলাদেশের ইতিহাস' অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সমকাল ৮.০৮.২০১৪

ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা করছে সরকার

উচ্চ আদালতের নির্দেশনার পর দেশের সব বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজে বিভিন্ন ধরনের ফি-র সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করতে যাচ্ছে সরকার। ইতোমধ্যে একটি খসড়া চূড়ান্ত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সম্প্রতি অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয়ের মাধ্যমে বিষয়টি আদালতে জানানো হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত একটি খসড়া কপি আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

জাবেদ ফারুক নামে এক ব্যক্তির করা রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট গত ২৩ এপ্রিল ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বেতন-ফি বিষয়ে রুল জারি করেন। রুলে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে প্লে-গ্রুপ থেকে এ-লেভেল পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন, পুনঃভর্তি ফি বা সেশনচার্জ আদায়ের বিষয়ে নীতিমালা তৈরির নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না– তা জানতে চান আদালত। পাশাপাশি মাসিক বেতন, ভর্তি ও পুনঃভর্তি ফি বা সেশনচার্জ আদায়ে তদারক করতে একটি মনিটরিং সেল গঠনের নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না তা জানাতে বলা হয়। শিক্ষা সচিব, আইন সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ ঢাকা শহরের প্রথম সারির ২৩টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছিল। এর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ও কলেজে বিভিন্ন ধরনের ফি-র সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়।

খসড়া নীতিমালায় বলা হয়েছে, ভর্তি ফরম এবং ভর্তির ফি বাবদ সরকারের নির্ধারিত ফি-র চেয়ে অতিরিক্ত আদায় করা হলে ওই প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। ১৯৬২ সালের ২০ নম্বর অধ্যাদেশ অনুযায়ী, নিবন্ধন নেওয়া সব স্কুল এবং স্কুল ও কলেজের ক্ষেত্রে এ নীতিমালা কার্যকর হবে বলেও এতে উল্লেখ রয়েছে।

খসড়া নীতিমালায় স্কুলগুলোকে শিক্ষার্থী সংখ্যার ভিত্তিতে তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে। আলাদা

করে ফি নির্ধারণ করা হয়েছে মহানগর ও মহানগরের বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭০০ বা তার বেশি হলে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'এ' ক্যাটাগরিভুক্ত হবে। ৪০০ থেকে ৭০০-এর মধ্যে হলে 'বি' এবং ৪০০-এর নিচে হলে 'সি' ক্যাটাগরিভুক্ত হবে। মহানগরী এলাকার 'এ' ক্যাটাগরির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাসিক বেতন সর্বোচ্চ ৩ হাজার এবং ভর্তি ও সেশন ফি সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা নিতে পারবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মহানগরের বাইরে হলে সর্বোচ্চ বেতন হবে ১৫শ' এবং ভর্তি ও সেশন ফির সর্বোচ্চ সীমা ১৫ হাজার টাকা। 'বি' ক্যাটাগরির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহানগর এলাকায় হলে সর্বোচ্চ মাসিক বেতন হবে ২০০০ এবং ভর্তি ও সেশন ফি সর্বোচ্চ ১৮ হাজার টাকা। মহানগরের বাইরে হলে সর্বোচ্চ মাসিক বেতন হবে ১০০০ এবং ভর্তি ও সেশন ফি সর্বোচ্চ ৭ হাজার টাকা। 'সি' ক্যাটাগরির মহানগর এলাকার প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ বেতন নেওয়া যাবে ১৫শ' টাকা এবং ভর্তি ও সেশন ফি নেওয়া যাবে ৮ হাজার টাকা। এই ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠান মহানগরীর বাইরে হলে সর্বোচ্চ মাসিক বেতন হবে ৮০০ এবং ভর্তি ও সেশন ফি হবে সর্বোচ্চ ৪ হাজার টাকা

সমকাল ১৮.০৮.২০১৪

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য

দেশের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি এবং প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানানো হয়েছে। রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে গতকাল রোববার বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আয়োজিত শিক্ষা সমাবেশে এ দাবি জানানো হয়।

সমাবেশে শিক্ষক নেতারা প্রধান শিক্ষকের এক ধাপ নিচে সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল নির্ধারণসহ শতভাগ পদোন্নতির দাবি জানান। একই সঙ্গে দ্রুত নিয়োগবিধি সংশোধন করে সহকারী শিক্ষক থেকে পরিচালক পর্যন্ত পদোন্নতির দাবিও জানান তারা।

সমিতির সভাপতি মো. আবুল বাসারের সভাপতিত্বে সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মো. মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব কাজী আখতার হোসেন এবং এই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট উম্মে রাজিয়া কাজল এমপি প্রমুখ।

সমাবেশে শিক্ষক নেতারা বলেন, নিয়োগবিধি সংশোধন করে সহকারী শিক্ষক থেকে পরিচালক পর্যন্ত শতভাগ পদোন্নতি, প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেল ৮ হাজার, সহকারী প্রধান শিক্ষকের বেতন স্কেল ৬ হাজার ৪০০ টাকা এবং সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল ৫ হাজার ৯০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। এ ছাড়া সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির জটিলতা দ্রুত নিরসনের দাবি জানান তারা।

গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার বলেন, সরকারের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। এরপরও সরকার চায় শিক্ষকরা ভালোভাবে জীবনযাপন করুক। শিক্ষকদের দাবি বাস্তবায়ন করার বিষয়ে ভেবে দেখা হবে।

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো. আনোয়ারুল ইসলাম তোতা বলেন, উচ্চ শিক্ষিতরা এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আছেন; কিন্তু বেতন কম থাকায় অনেকেই হীনমন্যতায় ভুগছেন। সিনিয়র সহ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন মানিক বলেন, স্বল্প বেতন থাকায় মেধাবীরা এখন আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় আসতে চাইছেন না।

সমকাল ১৮.০৮.২০১৪

প্রাথমিক বিদ্যালয় দখলের নিন্দায় বিশিষ্টজন

প্রাথমিক বিদ্যালয় দখলের অপতৎপরতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিশিষ্টজন। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে তারা এ নিন্দা জানান।

বিবৃতিতে তারা বলেন, সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভেঙে ফেলার চিত্র ও তথ্য আমাদের গভীরভাবে মর্মাহত করেছে। ঢাকার বেইলি রোডের 'সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' ও মিরপুর-২-এ 'চম্পা পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'-এর শিক্ষার্থীরা ফুটপাতে বসে পরীক্ষা দিয়েছে। কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি ঈদের ছুটির সময় বিদ্যালয়টি ভেঙে দিয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়। আর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কাছে চম্পা পারুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। দুটি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এই দুরবস্থায় আমরা বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা এটাকে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ওপর আক্রমণ বলে মনে করছি। জমি-সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি করে বিশেষ মহলের ভূমিদস্যুতার শিকার এসব শিক্ষার্থী খোলা আকাশের নিচে বসে পরীক্ষা দিতে বাধ্য হয়েছে। বিষয়টি 'সবার জন্য শিক্ষা'র রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার এবং শিশু অধিকার সনদের চূড়ান্ত লঙ্ঘন ও মানবাধিকারের পরিপন্থী।

বিবৃতিতে প্রশাসনের নাকের ডগায় দুটি বিদ্যালয় ভেঙে ফেলার এই অপতৎপরতার তীব্র নিন্দা জানানো হয়। বিবৃতিদাতারা বলেন, আমরা চাই না, আর কখনও এর পুনরাবৃত্তি ঘটুক। তারা প্রয়োজনীয় বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহ্বান জানান। বিবৃতিদাতারা হলেন- অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, এম হাফিজ উদ্দিন খান, ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, রাশেদা কে. চৌধূরী, সৈয়দ আবুল মকসুদ, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, আবদুল মজিদ, মামুনুর রশীদ, ইলিয়াস কাঞ্চন, অধ্যাপক এমএম আকাশ, অধ্যাপক শফি আহমেদ, খালেদ মাসুদ পাইলট, সেলিনা হোসেন, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. ইফতেখারুজ্জামান, খুশী কবির, আরোমা দত্ত, ইনাম আল হক, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, এমএ মুহিত, নিশাত মজুমদার, শাহীন আনাম, ফারাহ কবীর ও ডা. এজাজুল ইসলাম।

সমকাল ২২.০৮.২০১৪

বাল্যবিবাহের তথ্য চেয়ে চিঠি

প্রাথমিকের পর এবার লালমনিরহাট জেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৯০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের বাল্যবিবাহ-সংক্রান্ত তথ্য চেয়ে পাঁচটি উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় তাঁদের কাছে এই চিঠি পাঠায়।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলার পাঁচ উপজেলায় ৫২টি নিম্নমাধ্যমিক ও ১৫৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৮৪টি মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা আছে। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের ওই চিঠিগুলো বিদ্যালয়গুলোর প্রধান ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং মাদ্রাসার সুপারদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। লালমনিরহাট জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এস এম মোসলেম উদ্দিন এই নির্দেশ দেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নের জন্য বাল্যবিবাহ রোধ করা জরুরি। বাল্যবিবাহ রোধে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মাঝে সচেতনতা বাড়াতে হবে। অধ্যয়নরত কোনো শিক্ষার্থীর বাল্যবিবাহ হয়ে থাকলে তার শ্রেণি, রোল নম্বর উল্লেখ করে জেলা শিক্ষা কার্যালয়ে তথ্য পাঠাতে হবে। এছাড়া যখনই কোনো ছাত্রীর বাল্যবিবাহ ঠিক হবে, তখন তাৎক্ষণিকভাবে জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে তা বন্ধ করতে হবে এবং জেলা শিক্ষা কার্যালয়ে বিষয়টি জানাতে হবে।

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এস এম মোসলেম উদ্দিন বলেন, ১১ আগস্ট *প্রথম আলো*-তে 'পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীকে সভাপতির বিয়ে' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হলে বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে।

প্রথম আলো ২৩.০৮.২০১৪

পার্টনারশীপ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

১৮ ও ১৯ আগস্ট ২০১৪ গণসাক্ষরতা অভিযান কার্যালয়ে Partnership Management: Learning from Each Other শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানে বিদ্যমান পার্টনারশীপ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পার্টনারশীপ বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞ কয়েকটি সংস্থার গণসাক্ষরতা অভিযান কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করার জন্য সভাটির আয়োজন করা হয়।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে রাখেন তাসনীম আত্হার, পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান। মতবিনিময় সভায় পিকেএসএফ, ব্র্যাক, একশনএইড বাংলাদেশ এবং

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন-এর সঙ্গে তাদের পার্টনারশীপ গঠন প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে গণসাক্ষরতা অভিযান কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন মো. ফজলুর কাদের, ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর, পিকেএসএফ, মো. মনোয়ার হোসেন খন্দকার কর্মসূচি সমন্বয়কারী, এডুকেশন প্রোগ্রাম, ব্র্যাক, ডা. শামীম ইমাম ডিরেক্টর-ক্যাপাসিটি বিল্ডিং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, রিফাত বিন সাত্তার, ডিরেক্টর, প্রোগ্রাম এন্ড কোয়ালিটি ইমপ্যাক্ট একশনএইড বাংলাদেশ। মতবিনিময় সভায় গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ৪৫ জন কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

মির্জা কামরুন নাহার

আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১

২১ আগস্ট ২০১৪ তারিখ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ), দিনাজপুর ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর যৌথ উদ্যোগে দিনাজপুর-এ অনুষ্ঠিত হয় 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১' শীর্ষক আঞ্চলিক মতবিনিময় সভা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব রুহুল আমিন, উপাচার্য, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর। বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. রমজান আলী, অধ্যক্ষ দিনাজপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ এবং জনাব নিমাই কুমার দত্ত, চীফ ইন্সট্রাক্টর, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দিনাজপুর। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শাহ-ই-মবিন জিন্নাহ, নির্বাহী পরিচালক,

সিডিএ, গণসাক্ষরতা অভিযান-এর পক্ষে সভাটি আয়োজনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন মো. মিজানুর রহমান আখন্দ, উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব আব্দুল আজিজ, অধ্যক্ষ, টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ, পঞ্চগড়।

সংশ্লিষ্ট সরকারি বিভাগের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, প্রাইভেট দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিক্ষার্থী, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ সভায় ১০৩ জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন।

মিজানুর রহমান আখন্দ

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন

২১ আগস্ট ২০১৪ তারিখে ঢাকায় গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে "প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক ফলোআপ ওরিয়েন্টেশন"-এর একটি কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওরিয়েন্টেশন কোর্সটি উদ্বোধন করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ। গণসাক্ষরতা অভিযান-এর এই ওরিয়েন্টেশনের পূর্বে চার দিনব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন বিষয়ক বেসিক ওরিয়েন্টেশন আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত ওরিয়েন্টেশনের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে সে বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা করা হয় এই ওরিয়েন্টেশনে।

ওরিয়েন্টেশন গণসাক্ষরতা অভিযানের সদস্য ও সহযোগী সংগঠনের প্রতিনিধি, কমিউনিটি ওয়াচ এলাকার সদস্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইউনিয়ন শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য ও বিদ্যালয় ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যসহ মোট ২৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। কোর্স পরিচালনায় সহায়ক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্ট মেহের আক্তার ও গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সহকারী কার্যক্রম কর্মকর্তা তাজমুন নাহার ।

তাজমুন নাহার

চাই শ্রেণিকক্ষে কর্মকেন্দ্রিক ও আনন্দদায়ক শিক্ষা এবং শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ উন্নয়ন

গণসাক্ষরতা অভিযান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহায়তায় ২৪-২৮ আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত 'প্রাথমিক শিক্ষায় কর্মকেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি ধারণা-প্রদায়ী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে। নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে কার্যকর ও কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষণ-শিখন পদ্ধতি প্রয়োগ ও চর্চার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নই এ প্রশিক্ষণের অন্যতম উদ্দেশ্য। উপর্যুক্ত প্রশিক্ষণে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ মোট ২৫

জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও কোর্সে ২ জন পর্যবেক্ষক প্রশিক্ষণার্থী উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মনীন্দ্র নাথ রায়। তিনি বলেন, সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহ কাজ করার ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় অনেক উন্নয়নও হয়েছে।

রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) আতাউর রহমান, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) মো. সাইদুর রহমান, গবেষণা কর্মকর্তা মো. মুরশিদ আকতার, এনসিটিবি-র প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান সরকার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর বিভাগীয় প্রধান মো. মুজিবুর রহমান ও মো. মিজানুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক বাউবি। কোর্স পরিচালনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ ও উর্ধ্বতন উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক এনামুল হক খান।

এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তবভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় মাঠ পরিদর্শনের অংশ হিসেবে দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'লতিফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' গাজীপুর-এর কার্যক্রম পরিদর্শনের আয়োজন করা হয়।

মিজানুর রহমান আখন্দ

কমিউনিটি নিরীক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গত ২৬ আগস্ট ২০১৪ গণসাক্ষরতা অভিযান-এর সিভিল সোসাইটি এডুকেশন ফান্ড (CSEF) কর্মসূচির আওতায় স্পেক্ট্রা কনভেনশন সেন্টারে কমিউনিটি নিরীক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে অধ্যাপক ড. কাজী সালেহ্ আহমেদ, সাবেক উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ও ড. আনোয়ারা বেগম, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, বিআইডিএস। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালক মো. ইমরান। একশন এইড বাংলাদেশ, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহছানিয়া মিশন, আরডিআরএস এবং রস্ক তাদের কমিউনিটি অডিট বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ সভায় তুলে ধরেন। উপস্থাপনাসমূহে কমিউনিটির সম্পৃক্ততা জোরদার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছে।

শিক্ষাবিদ, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং এডুকেশন ওয়াচ দলের সদস্যগণ এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাসহ মোট ৮০ জন উপস্থিত ছিলেন। সভা সঞ্চালনা করেন গণসাক্ষরতা অভিযান-এর উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক।

কমিউনিটি নিরীক্ষা বিষয়ক মতবিনিময় সভার ধারাবাহিকতায় ২৭-২৮ আগস্ট ২০১৪ অভিযান কার্যালয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী কমিউনিটি নিরীক্ষা জন্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

দু'দিনের কর্মশালায় তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-এর সহকারি পরিচালক মো. ওয়ালিউল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর শিক্ষা কর্মকর্তা আজহারুল ইসলাম, চ্যানেল আই-এর সিনিয়র রিপোর্টার মোস্তফা মল্লিক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ বাস্তবায়নকারি সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ, শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও গণসাক্ষরতা অভিযানের কর্মকর্তাগণ সহ মোট ৪৯ জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার সমাপনীতে ডিএফআইডি-র এডুকেশন এডভাইজর ফজলে রব্বানী উপস্থিত ছিলেন।

সামছুন নাহার কলি

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৪ পরিকল্পনা সভা

প্রতি বছরের মতো এবারও গণসাক্ষরতা অভিযান বেসরকারি সংস্থা এবং সিভিল সোসাইটি গ্রুপের সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০১৪ উদযাপন করতে যাচ্ছে। এ বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের প্রতিপাদ্য হলো 'Literacy and Sustainable Development', যার বাংলা ভাষান্তর করা হয়েছে 'সাক্ষরতা ও টেকসই উন্নয়ন'। এই প্রতিপাদ্যের আলোকে শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে 'টেকসই উন্নয়নের মূলকথা, সাক্ষরতা আর দক্ষতা'।

২৭ আগস্ট ২০১৪ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ কক্ষে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৪ উদযাপন সংক্রান্ত একটি পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-এর এবারের প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় গণসাক্ষরতা অভিযান তার সহযোগী সংগঠন এবং সিভিল সোসাইটির সংশ্লিষ্ট গ্রুপের মাধ্যমে সরকারি/বেসরকারি সহায়তায় কি ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে মতবিনিময় ও প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী স্ব-উন্নয়ন-এর নির্বাহী পরিচালক মোস্তাফিজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কার্যক্রম ব্যবস্থাপক মোস্তাফিজুর রহমান এবং সভাটি পরিচালনা করেন

অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ। সভায় ৭০ জন অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০১৪ উপলক্ষে গণসাক্ষতা অভিযানের বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্থানীয় পর্যায়ে সহযোগী সংগঠনের সাথে যৌথ উদ্যোগে দিবসটি উদযাপনের জন্য দেশের ৭টি বিভাগের ১৪টি জেলার ১৪টি সংগঠন নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে ২৮ আগস্ট ২০১৪ তারিখে অভিযানের প্রশিক্ষণ কক্ষে আরো একটি পরিকল্পনা সভার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে কি কি কর্মসূচি আয়োজন করা যেতে পারে সে বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ফারদানা আলম সোমা

জনস্বাস্থ্য রক্ষা করুন
মাছে ফরমালিন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন

মনে রাখবেন কেবল ভোক্তাদের জন্য নয় ফরমালিনযুক্ত মাছ বিক্রেতাদের স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর

ফরমালিন আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে:

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়।
- পরিপাকতন্ত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে।
- দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেতে পারে।
- গর্ভাবস্থায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।
- চর্ম, এলার্জি, শ্বাসকষ্ট, এজমা দেখা দিতে পারে।
- কিডনি ও লিভারের রোগ এমনকি ক্যান্সারের মত মারাত্মক রোগের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে।

চেনার উপায়:

ফরমালিনযুক্ত মাছ	ফরমালিনমুক্ত মাছ
• চক্ষুগোলক ভিতরের দিকে ঢুকানো এবং ফ্যাকাশে দেখায়।	• চোখে স্বাভাবিক এবং লালচে বর্ণের দেখায়।
• মাছের গায়ের স্বাভাবিক পিচ্ছিলতা থাকে না।	• মাছের গায়ের স্বাভাবিক পিচ্ছিলতা থাকে।
• ফুলকা কালচে বর্ণের দেখায়।	• ফুলকা লালচে বর্ণের দেখায়।
• দেহ অপেক্ষাকৃত শুষ্ক থাকে।	• দেহ শুষ্ক নয়।
• মাছে মাছি বসে না।	• মাছে ওপর মাছি বসে।
• মাছের স্বাভাবিক গন্ধ পাওয়া যায় না।	• মাছের স্বাভাবিক গন্ধ পাওয়া যায়।
• মাছ সহজে পচে না।	• স্বাভাবিকভাবেই মাছ পচে যায়।

মাছে ফরমালিনের ব্যবহার মৎস্য আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ

এক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে

গণসাক্ষরতা অভিযান তথ্য বিতরণ, সঞ্চালন ও কার্যক্রমের আওতায় জনস্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের বার্তা, তথ্য, শ্লোগান ইত্যাদি *সাক্ষরতা বুলেটিন*-এ নিয়মিত ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সরকারি, বেসরকারি সংস্থাসমূহের উন্নয়নমূলক ও মানবাধিকার সম্পর্কিত এ ধরনের বার্তা, তথ্য ও শ্লোগান বুলেটিন কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য সকল শুভানুধ্যায়ীর কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সাক্ষরতা বুলেটিন

সংখ্যা ২৪৩ ভাদ্র ১৪২১ আগস্ট ২০১৪

আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস সংখ্যা

স ম্পা দ ক

১৯৯৩ সালে জাতিসংঘ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস উদযাপনের ঘোষণা প্রদান করে। সেই হিসেবে এ বছর তা একুশে পা দিল, সরসভাবে বলা যায় দিবসটির বয়স্কতা প্রাপ্তি ঘটল। দু'দশক পেরোনোর এমন বিশেষ মুহূর্তে নিশ্চয়ই পেছন ফিরে তাকিয়ে অর্জন-অনার্জনের একটা হিসেব-নিকেশ করা যায়। প্রাপ্তির ঝুড়িতে যে একেবারে কিছুই জমা হয়নি, সেকথা হয়ত বলা যাবে না। কিন্তু এবারও এই দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বাণীতে জাতিসংঘের মহাসচিব বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, আদিবাসীদের প্রাপ্য অধিকার এখনো তারা পায়নি, তাদের নিরাপত্তা আমরা অদ্যাবধি নিশ্চিত করতে পারিনি। তিনি যেকথা সবচেয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তা হল, আমাদের সকলের সম্মিলিত কল্যাণময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য বৈশ্বিক উন্নয়ন ভাবনা ও প্রক্রিয়ায় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহকে অর্থবহভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।

বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে অতীতের দিকে তাকালে নিশ্চয়ই অনুধাবন করব যে, আদিবাসীদের বিষয়ে বৈশ্বিক মনোযোগ আকর্ষণ করতে আমাদের বিংশ শতাব্দীর সর্বশেষ দশক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। বহু শতাব্দীর একটা প্রবচন এখনো অক্ষয় হয়ে আছে যে, 'একেবারে না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়াও ভাল'। অমন আপ্তবাক্যকে সান্ত্বনা মেনে আদিবাসীদের ওপর চলে আসা সকল নিপীড়ন ও বৈষম্য দূর করার জন্য আমাদের যথাযথ বা কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে এবং অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমাদের গৃহীত ব্যবস্থাদিকে ত্বরান্বিত এবং তার চেয়েও বড় কথা, সুপরিকল্পিতভাবে প্রণয়ন করতে হবে।

বাংলাদেশে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নে দৃশ্যমান কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এদেশের আদিবাসীদের অপাংক্তেয় বা প্রান্তিক করে রাখার একটা প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাবে অতীত ইতিহাসের পাতায়। এদেশের আদিবাসীরা তাদের বহু-কাঙ্ক্ষিত সাংবিধানিক স্বীকৃতি পাইনি অদ্যাবধি এবং এই দাবির পক্ষে যৌক্তিকতা যতই তীব্র হোক না কেন, এমন স্বীকৃতি তাদের কপালে সহসা জুটবে, এমন আশা করা যায় না। কারণ, সরকার মনে করে, এদেশে কোন আদিবাসী জাতিসত্তার অস্তিত্ব নেই।

আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের, প্রধানত প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের উদ্যোগে অবশ্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া যাচ্ছে এবং এ বিষয়ে এ পর্যন্ত সরকারকে আন্তরিক বলেই মনে হচ্ছে। বহুভাষিক শিক্ষাক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিভিন্ন বেসরকারি সাহায্য সংস্থার ভূমিকা দিন দিন বাড়ছে। আরো আশার কথা, আদিবাসীদের মধ্যেও এ বিষয়ে বেশ সচেতনতার সৃষ্টি হয়েছে।

নানা বাধা ও প্রতিকূলতা পেরিয়ে বাংলাদেশের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী মূলস্রোতের সঙ্গে মিলেমিশে এক সুদৃঢ় ভবিষ্যত নির্মাণ করবে, আজকের দিনে এই আমাদের প্রত্যাশা।

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক শফি আহমেদ

সম্পাদক
রাশেদা কে. চৌধূরী

প্রচ্ছদ
আদিবাসী নৃত্যশিল্পী

গণসাক্ষরতা অভিযান ৫/১৪ হুমায়ূন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ কর্তৃক প্রকাশিত। মেসার্স তিথি প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ২৮/সি-১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

সম্পাদকীয় যোগাযোগ● ফোন: ৫৮১৫৩৪১৭, ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১-২ ফ্যাক্স: ৯১২৩৮৪২মেইল: info@campebd.org Website: www.campebd.org